টুসু ঃ ইতিহাসে ও সংগীতে

দিব্যজ্যোতি মজুমদার
সম্পাদিত

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর, ১৯৫৬

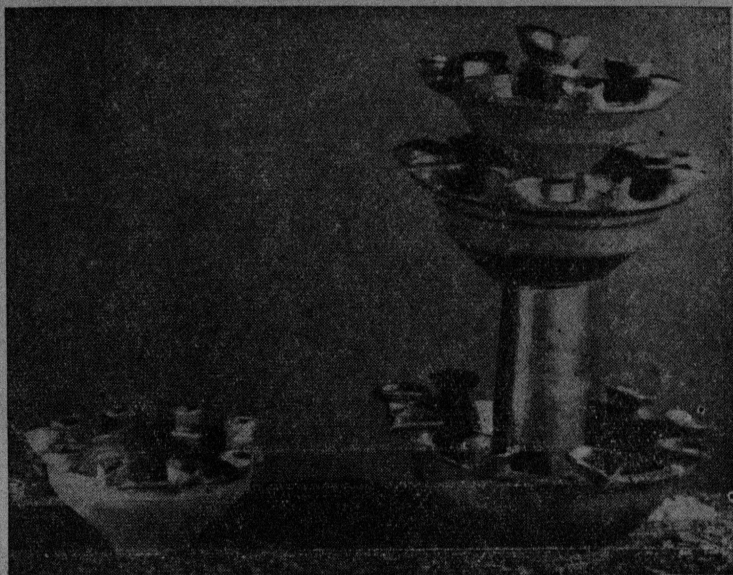
প্রকাশক
অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর
৪৬/২, গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
শক্তিপদ আড়ু
নিউ মা-কালী প্রিণ্টার্স
১২/১, রামচাঁদ ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রয়াত লোকসংস্কৃতিবিদ অরুণকুমার রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা



টুসু প্রদীপ : মুক্তির শিখা



টুসু চোড়ল : সমাজ জ্ঞান



টুসু ভাসান যাত্রা ঃ   কালের সীমানায়



টুসু ভাসান ঃ   একসূত্রে সহস্র প্রাণ

আলোকচিত্র ঃ   সনৎকুমার মিত্র ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

টুসুব্রতের উৎসচিন্তা

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

"আমার কোনকথাই শেষ কথা নয়। সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের কাছে শেষ কথা কিছু নাই। তাঁহার সব কথাই experiment with truth মাত্র।"
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)

"প্রাণ জিনিষটা বড়ই রহস্যময়। সে যা নেবার তা ভাল করেই নেয় অথচ বৃথা ভার সে জমিয়ে রাখেনা। যা কিছু প্রাণের পক্ষে অনাবশ্যক তা সে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করে (culmination)। শরীর যখন এই শক্তি হারায় অর্থাৎ যা ত্যাজ্য তা ঠিকমত ত্যাগ করতে পারেনা তখনই নানা ব্যাধি ও দুর্গতি এসে তাকে ঘিরতে থাকে। বাংলাদেশ চিরদিনই এই ব্যাধি হতে মুক্ত ছিল"। ১

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সামনে রেখে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে যে কোন আচার অনুষ্ঠান তার রূপ পরিবর্তন করে। প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে রূপ পরিবর্তন করে চলে বলেই সমকালীন জীবনেও তাদের বেমানান লাগেনা। কিন্তু এই ব্রত পার্বণসমূহ প্রথম স্তরের লৌকিক জীবনচর্যা থেকে উঠে এসে পৌরোহিত্যের শাস্ত্রানুশাসনের (শাস্ত্র = শাস্+ষ্ট্রন্, বিধি নিষেধের নিয়ম) বেড়াজালে আটকা পড়ে; তখন তার প্রাণস্পন্দন হারিয়ে গিয়ে এসে দাঁড়ায় সেখানে অনুষ্ঠান সর্বস্বতা।

প্রসঙ্গত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যও স্মরণীয়ঃ

"...উত্তরকালে, যজ্ঞ, ছন্দ আর সামগানের অর্থই বদলায়নি, বদলে গিয়েছে...দেবতা নামের তাৎপর্যও।...পূর্বপুরুষেরা এককালে যে পর্যায়েই জীবনধারণ করতেন আর তা-ই তাদের পরবর্তীকালের রচনাতেও সে পর্যায়ের ধ্যানধারণার স্মারক কিছু কিছু থেকে গিয়েছে।" ২

দুজনের দুটি উক্তিই টুসুব্রত ও গান সম্পর্কে প্রযোজ্য। যেহেতু পৌরোহিত্যের অনুশাসনের বাইরে, তাই টুসু প্রতিনিয়তই চলমান জীবনকে স্বাঙ্গীকৃত করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে টুসু উৎসব দুর্গোৎসবের মতই প্রাণচঞ্চল। গ্রহণবর্জন প্রাণের ধর্ম।

এইধর্ম একদিকে যেমন চলমানতা আনে, অন্যদিকে তেমনি মূল বা উৎসচিন্তায় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। টুসু-উৎসবে তেমনটি ঘটেছে।

আরও একটি দিক আছে। সেটি হচ্ছে ব্রতের বা উৎসবের আঙ্গিক-উপকরণের। আমরা যখনই কোন ব্রত-উৎসব সম্বন্ধে চিন্তা করি তখনই তাকে শাস্ত্রানুমোদনের আলোকে দেখতে চাই বা যাই। ভুলে যাই যে যেকোন (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) উৎসবই লৌকিক জীবন থেকে উঠে এসে প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্রের বাঁধনে আটকা পড়ে পরবর্তীস্তরে। যে সব ব্রত এর আওতার বাইরে থেকে যায় তাদের মধ্যে শাস্ত্রের তথাকথিত শুচিতা আশা করা বৃথা। ব্রতিনীদের মানসচিন্তাই সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়, শাস্ত্রশুচিতা নয়। টুসুতে এই অশাস্ত্রীয় ব্যাপারটা প্রকট।

টুসু ব্রতের আঙ্গিক-উপকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে যে দিক-গুলো চখে পড়ে তাদের মধ্যে প্রথমেই আসে মূর্তির কথা। আজকাল অনেক জায়গাতেই একটি মানবীমূর্তি তৈরী করে টুসুব্রত সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায় সব গবেষকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে টুসুর মূর্তি অতি আধুনিককালের অবদান। প্রাগাধুনিক চিন্তায় টুসুব্রতে মূর্তি প্রসঙ্গে যে দিকগুলো পাওয়া যায়, তারা হল মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :

একটি মাটির সরাকে পিটুলির গোলা দিয়ে সাদা রং করে লাল আর সবুজের ফোঁটা দিয়ে চিত্রিত করে তাতে তুষ ভর্তি করে দেওয়া হয়।৩ কোন কোন অঞ্চলে অকলঙ্ক মাটির সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার ওপর গোবরের নাড়ু তৈরী করে রাখতে হয়। প্রত্যেক নাড়ুতে সিন্দুরের ফোঁটা এবং দূর্বা গুঁজে দিতে হয়। তার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় তুষ-কুঁড়ো।৪ কোথাও মাটির সরাকে সাদা রং করে তাতে সিন্দুরের পঞ্চাঙ্গুলিক দেওয়া হয়। তারপর তুষ ভর্তি করে বকনা বাছুরের গোবরের গুলি পাকিয়ে দেওয়া হয়।৫ কাঁচা গোবরের সঙ্গে তুষ মিশিয়ে গুলি করে দেওয়ার রীতিও আছে। এক্ষেত্রে গোবর আবার অ-মৃতবৎসা গাভীর হওয়া চায়।৬ কোথাও বা বকনা বাছুর চায়, এঁড়ে হলে চলবে না।

কোন কোন অঞ্চলে প্রত্যেক ব্রতিনীর নিজস্ব টুসুর ঘট পাতা হয়। পোরকুল অঞ্চলে (বা অন্যত্র) কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাটিতে গর্ত কেটে টুসু পূজা হত। পুরুলিয়ার গ্রামে এখনও কোন কোন গ্রামে

বাড়িতে তুলসীতলায় মাটি কেটে গর্ত করে তাতে তুষু পূজা হয়।৭ গর্তে গোবরও থাকে।

কোন কোন অঞ্চলে কয়েকটি শালকাঠি বা দাঁতনকাটা একটি ঠোঙার মধ্যে রেখে ফুল দিয়ে পূজো করা হয়।৮

টুসু প্রতীকরূপে 'আলোখলা'ও থাকে।

এই প্রতীকগুলোর সঙ্গে আরও তিনটি দিক টুসুব্রতে লক্ষণীয়। প্রথমত চৌড়ল বা চোড়ল বা চৌদল্লা। পৌষের যে একমাস ধরে উৎসব তথা ব্রত চলে তার সব সময়-ই এটি থাকেনা। পৌষ সংক্রান্তির মাত্র কয়েকদিন আগে এটিকে এনে টুসু আসনের কাছে রাখা হয় এবং ভাসানের দিন এতে টুসুমূর্তি অথবা টুসুসরাকে ভাসান দিতে পুকুরে অথবা নদীতে নিয়ে যেতে হয়। কোন কোন গানে দেখা যায় ভাসান-উৎসব হত টাঁড়ে (=প্রান্তরে: টুসু ভাসান/পরব টাঁড়ে/টুসুর গানে/মন মাতে)।৯

আর একটি টুসু প্রতীক ঐ সরারই অন্যতর রূপ টুসুখলা। একতলা, দোতলা বা তিনতলা এই 'খলা'গুলোতে প্রদীপ সাজিয়ে দেওয়া হয়। প্রদীপের সংখ্যা কত হবে এটার কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ, মূলে কত ছিল তা-ও নির্দিষ্ট জানা নেই।

তৃতীয় দিক হচ্ছে টুসুর ভেলা। এই ভেলাতে করে টুসু-খলাগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় (তের চূড়া ভেলা তুষুর প্রদীপখলা তাতে গো)।১০

বিভিন্ন ফুল দিয়ে টুসুকে সাজানো হয়। এর মধ্যে বিশেষ করে আছে বাসক, সরষে, মূলো, পদ্ম, জবা, গাঁদা। টুসু গান (বা ছড়ায় আরও দুটি ফুল বারে বারে ঘুরে এসেছে—তিল এবং করবী)।

টুসু (পূজায়) উৎসবে বা ব্রতে প্রচলিত শাস্ত্রানুমোদিত নৈবেদ্যবিধি নেই। মূলো-মুড়ি যাহোক ফলমূল নৈবেদ্য হিসাবে রাখা হয়। তথাকথিত নৈবেদ্যের প্রাধান্য না থাকলেও পিঠেপুলি টুসু ব্রতের অন্যতম অঙ্গ। তিল পিঠা তৈরীতে অবশ্যই থাকে।

টুসুব্রতের অন্যতম প্রধান উপকরণ ছড়া। কোন অঞ্চলে মেয়েরা 'সারা পৌষমাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় করে টুসুমনির গান'; কোথাও বা 'উঠানের একটা অংশ নিকিয়ে তেঁষালা সরা নামিয়ে প্রদীপ জ্বেলে শীতার্ত কণ্ঠে পূজা আরম্ভ হয় নিত্য শেষ রাত্রে।' এক কথায় এটি রাত্রির উৎসব; সে সন্ধ্যায়ই

হোক আর ভোরেই হোক। কেউ বলেছেন, 'সকালবেলার ব্রত এটি।'

পাড়ার কোন একটি বিশেষ বাড়িতে ব্রতিনীরা সমবেত হয়ে পূজো করে। কোন দেবতা তা এখনও নির্দিষ্ট না হলেও।'ভুমুগানে শিবের আবির্ভাব কেন বারবার ঘটেছে' ? ১৭—এমন প্রশ্ন আছে। শিব যেমন টুসু গানে বারে বারে আসেন তেমনি আসে 'ছাতা'। পৌষালি উৎসব টুসুর গানে বসন্তের বার্তাবাহী কোকিলের কুহু কেন শোনা যায় ?

অবনীন্দ্রনাথের মতে এটি 'খেত উর্বর করে তোলার ব্রত।' ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে এটি শস্যোৎসব। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে—কৃষি-সংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা। আবার কারো মতে-'এ পূজা লক্ষ্মীরই পূজা। ১২ তুষ (তুষলি) ব্রতে কেউ কেউ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী-দেবতার কল্পনা করেছেন। ১৩ শ্রীশরৎচন্দ্র রায়ের আলোচিত উষা বা ওযা ব্রত থেকে টুসু এসেছে-এমন চিন্তাও কেউ কেউ করেন। ১৪ শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর চৌধুরী সংকলিত একটি গানে পরোক্ষভাবে ষষ্ঠীদেবী এসেছেন (টুসুমাকেও কিনে দিবেন/ষাইটু (ষষ্ঠীব্রত) কৈরবার ডালা)। ১৫ কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে টুসুব্রতে "দোল বা বসন্তব্রতের প্রভাব লক্ষ্য" করা যায়। টুসু লক্ষ্মীরই পূজা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বারমাসে যেমন তের ষষ্ঠীর ব্রত হয় তেমনি তের লক্ষ্মীর প্রচলনও আছে বাংলার কোন কোন পল্লী অঞ্চলে।

টুসু মূলত পৌষালি উৎসব। অঘ্রানের সংক্রান্তির দিন টুসুর প্রতিষ্ঠা। পৌষ-সংক্রান্তিতে বিসর্জন। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা, বিশেষ করে পাড়ার কুমারী কন্যাকুল একটি বিশেষ বাড়িতে জড়ো হয়ে টুসুর গান গায়। সারা মাস ধরে এমনি করে গানের মধ্য দিয়ে কুমারী-মনের কামনা-বাসনাগুলিকে, টুসু-উৎসবকে কেন্দ্র করে, উজাড় করে দিয়ে টুসুর ভাসান দেয় তারা। ভাসানের আগের দিন হয় টুসুর 'স্বাদ' (সাধ-ভক্ষণ) অনুষ্ঠান। কোথাও কোথাও সাধ-এর পরিবর্তে বিসর্জনের আগের রাত্রে হয় 'জাগরণ-উৎসব'। টুসু-উৎসবের বিশেষ করে এই সময়ে আদিম ও অমার্জিত রূপটি একটু বেশী মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। ১৬ জাগরণ-উৎসব মূলত বাসর সজ্জাকে কেন্দ্র করে বাসর রাত্রেই হয়ে থাকে। তাই জাগরণের রাত্রির আনুষ্ঠানিক দিকগুলোকে কেন্দ্র করে সাধের পরিবর্তে বিবাহ কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়।

"তুষুর খলা ভাসিয়ে অবগাহন স্নান সেরে উঠে আসে ব্রতচারিণী। ছেলেরা খড়, বাঁশ, পাটকাঠি বেঁধে বিরাট গাছ তৈরী করে রাখে অথবা 'ম্যাড়াঘর'। তাতে আগুন দিয়ে বহ্ন্যুৎসব চলে এবং আগুন পোহায় ব্রতচারিণীরা। মকর পাতানো চলে।" ১৭

মেদিনীপুর অঞ্চলে টুসু প্রধানত তিনদিনের উৎসব১৮ (দুর্গাপূজাও মূলত তিনদিনের। ষষ্ঠী বোধনের দিন; বিজয়া দশমী বিসর্জনের। পূজা হয় সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথিতে)।

টুসু যদি শাস্ত্রানুমোদিত উৎসব হতো তবে তার আঙ্গিক প্রকরণের দিনগুলোতে একটা নিয়ম নির্দেশ দেখতে পেতাম। তখন 'আর্যীকরণের' ফলে এখানকার অনেক উপাদান-উপকরণই হয়তো বাদ পড়ত (যেগুলোর তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন)। তথাকথিত আর্যীকরণ যখন হয়নি, আঙ্গিক উপকরণসমূহে যখন এখনও পৌরোহিত্যের প্রলেপ পড়েনি তখন এদের পেছনে কী ধরণের মানসিকতা কাজ করেছিল, ব্যবহারের প্রাথমিক স্তরে, তা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

দুই :

"নানা জঞ্জালের মধ্য থেকে খাঁটি ব্রতের চেহারাটির একটা আদর্শ বার করে আনতে হলে শুধু এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফল হবেনা, পৃথিবীর সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কিভাবে চলেছে তার ইতিহাসগুলিও দেখা চাই।"১৯

অবনীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে টুসুব্রতকে বিচার বিশ্লেষণ বা আলোচনা করলে অনেক বেশী ফল পাওয়া যেতে পারে। যেমন, টুস উৎসব প্রতি ঘরে হয়না। পাড়ার কোন একটি বিশেষ বাড়িতে বা স্থানে এটি হয়ে থাকে। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি শিবপূজোর জন্য আমাদের পাড়ার মেয়েরা সবাই এসে আমাদের বাড়িতে জড়ো হতেন। কেবল শিবচতুর্দশী ব্রতই নয়, সূর্যপূজা, উদ্ধার-চণ্ডী এমনি বহু মেয়েলি ব্রত ছিল যেগুলি নিজস্ব গৃহে করণীয় ছিলনা। কখনও পুকুর বা নদীর ঘাটে, কখনও কোন এক নির্দিষ্ট পুরোহিতের বাড়িতে এরা ব্রতিনীদের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হত।

এই চিত্র শুধু আমাদের দেশেরই নয়। প্রাচীন রোমেও এই একই রীতি

ছিল। 'বোনাদেয়া' একান্তভাবে নারী সমাজের দেবী। পয়লা মে তারিখে কোন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে দেবদাসীরাই কেবলমাত্র এই পূজার পরিচালনা করত। সেখানে পুরুষের প্রবেশ ছিল একান্তভাবে নিষিদ্ধ।

রোমে যখন বোনাদেয়া পূজিতা হতেন তখন রোমক সভ্যতা উন্নতির শীর্ষে। কিন্তু এই পূজার জন্ম তো তখন নয়। বিশেষ করে ব্রতিনীদের যৌথ উপাসনা পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মানব সভ্যতার সেই যুগকে যখন ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠীচেতনাই বড। টুসু উৎসবও এর ব্যতিক্রম নয়। মেয়েরা সমবেতভাবে টুসুপূজো করছে। টুসুগানেও বারেবারে আমাদের' শব্দটিই প্রযুক্ত হয়েছে, 'আমার' নয়।

সে যা-ই হোক, যেহেতু টুসুব্রতে আর্যীকরণ বা আর্যীভবনের ভাব সুস্পষ্ট নয়, তাই কেউ কেউ অনুমান করেন—আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হবার আগে থেকেই টুসু উৎসব এদেশে প্রচলিত ছিল।২০—এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে গেলে রাঢ়বাংলা বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মোটামুটি পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

"নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নিগ্রিটো বা নিগ্রোবাটুজন।...বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগ্‌দীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্যশিকারী নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যে, ময়মনসিংহ নিম্নবঙ্গের কোন কোন স্থানে কচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের লোকেদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোঁড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ, ঘনশ্যাম বর্ণ, প্রায় ঊর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্‌টালো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতো নিগ্রোবাটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়। নিগ্রোবাটুদের এই বিস্তৃতি হইতে অনুমান করা চলে যে,...এক সময় ওই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাংলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল।...

"নিম্নবর্ণের বাঙালীর এবং বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Austroloid)। তাঁহারা মনে করেন যে, এই জন একসময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ভারত, সিংহল একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।...বর্তমান বাংলাদেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোঁড়, মালপাহাড় প্রভৃতিরা যে আদি অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ অনুমান নরতত্ত্ব বিরোধী নয়।

"ভারতবর্ষের জনবহুল সমতলস্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে পূর্বোক্ত আদিম অধিবাসীদের দেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ দেহলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহ-দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ খর্ব এবং গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোঁট পুরু এবং মুখগহ্বর বড়, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা হইতে ঘন বাদামী।...বাংলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং অন্ত্যজ-পর্যায়ে যে দীর্ঘমুণ্ডের ধারা দেখা যায়, তাহাও মূলত এই নর-গোষ্ঠীরই দান।...বিরাজশঙ্কর গুহমহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, একসময় এই দীর্ঘমুণ্ডী গোষ্ঠী উত্তর আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে নব্যপ্রস্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য-দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব দেশে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে।

"এই সদ্যকথিত জন ছাড়া আরও দুইটি দীর্ঘমুণ্ডজন কিছু পরবর্তীকালেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।...

উপরোক্ত দীর্ঘমুণ্ডজনেরা যে জনস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল, উত্তর পশ্চিম হইতে তাহার উপর এক গোলমুণ্ডজন আসিয়া নিজেদের রক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত করিল।... ইহাদের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের দীনারীয় এবং কতকাংশে আর্মানীয় জাতির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই জাতিই লাপোং, রিজলী, লুস্‌সান এবং রমাপ্রসাদচন্দ কথিত অ্যালপাইন (Homo-Alpinus) নর-গোষ্ঠী, বিরাজশঙ্কর গুহ কথিত অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী, ফন্‌ আইক্‌স্টেডে্‌ট্‌-কথিত পশ্চিম ও পূর্ব 'ব্রাকিড' বা গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী, বাঙলাদেশের উচ্চবর্ণের ও মধ্যম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি তীক্ষ্ণ ও উন্নত এবং মধ্যম নাসাকৃতি ও মাধ্যমিক দেহদৈর্ঘ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকাংশে এই নরগোষ্ঠীরই দান। বস্তুত, বাঙলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলীয়, এই দুই জনের লোকেদের কীর্তি। পরবর্তীকালে আগত আর্য ভাষাভাষী আদি নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণপ্রবাহমাত্র, এবং প্রবাহ বাঙালীর

জীবন ও সমাজবিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ ; ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।" (পৃঃ ৪০-৪৩)।২১

"আদিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধ্য-নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড অ্যাল্পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তরভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর ক্ষীণধারা—এই কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালীজনের সৃষ্টি।" (পৃঃ ২১ ৮০)।

আমাদের আলোচনায়, অনেকক্ষেত্রে আর্য-অনার্য তত্ত্বই প্রাধান্য পায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার আর্য বা অনার্য কোন জনগোষ্ঠীর নাম নয়—এ পরিচয়ে ভাষা এবং সংস্কৃতিগোষ্ঠীর। নৃতত্ত্বের বিচারে, গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে এরা একাধিক জন। কালের গতিপ্রবাহে এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে একের প্রভাব অন্যের উপর পড়েছে। সে প্রভাব, অনেক সময়, এদেশে এসে পড়েছে, কখনও বা তাদের পূর্ববাসস্থানেই। আর্যসংস্কৃতিও তার ব্যতিক্রম নয় ঃ

"...ভারতবর্ষে তাহারা (আর্যভাষাভাষীরা) বৈদিক ধর্ম ও দেববাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল ; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ায় অন্য সভ্য (ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।" ২২

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে, ঘটেছে। এই মিশ্র জনগোষ্ঠীই ভারতে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে। এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে। যেহেতু শাস্ত্রশাসিত আমাদের পূজাপার্বণগুলির বর্তমান রূপ পরবর্তীকালে সমাজের উচ্চবর্ণের অবদান, তাই নিম্নস্তরের সমস্ত আঞ্চলিক রূপের প্রতিফলন এতে না ঘটলেও এদের কোন বিশেষ কৃষ্টির অবদান বলে চিহ্নিতক রা যাবে না। বহু চিন্তার বিচিত্র ফসল এরা। লোক-উৎসবও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৈদিক আর্যরা (ভাষাভাষী) নিজেদের মিশ্রসংস্কৃতিতে "বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য (ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর চিন্তাধারাকে বয়ে এনেছিল,—এটা যেমন সত্য, তেমনি "গ্রীক, টিউটন, লাতিন, স্লাব প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যশাখাগুলি হইতে পৃথক হইয়া ভারতে প্রবেশের পূর্বে প্রাচীন বৈদিক আর্যগণ এবং বর্তমান পার্শিসম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ ইরানীয় সম্প্রদায় একসঙ্গে বহুদিন ধরিয়া মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করিতে থাকেন। ইহাকে ইন্দো-ইরানীয় যুগ বলা হয়।' ২৩—এটাও ঐতিহাসিক সত্য।

অর্থাৎ, বাঙালীর সংস্কৃতিতে আমরা একদিকে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন প্রবাহ পাব, তেমনি ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর একই লোক-সংস্কৃতিগত চিন্তার চিত্র দেখতে পাব। যেহেতু সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার জনপ্রবাহে বিভিন্ন বিদেশাগত জনের তরঙ্গভঙ্গ আছে, তাই বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির আলোচনায় বিভিন্ন দেশের চিন্তার উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

তিন ঃ

টুসুব্রতের সরার বা কুণ্ডের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে গোবর, তুষ, দূর্বা, তুলসী, পিটুলী, সবুজদাগ, সিন্দুর—এইগুলোর উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি। তাই প্রসঙ্গ না টেনে এবার কেবল আলোচনায় আসছি।

অনেকে বলেছেন, গোবর দিয়ে ধরিত্রীকে শস্য ফলনের উপযুক্ত উর্বরা করে তোলাই তুষু বা টুসুব্রতে গোবর ব্যবহারের উদ্দেশ্য। কিন্তু, ভারতীয় লৌকিক ধর্মের আচরণ-চিন্তায় গোবরের ব্যবহার বহুদিন থেকেই চলে আসছে। গ্রামীণ সভ্যতায় উঠানকে গোবরের ছড়া দিয়ে, ঝাঁট দেওয়ার রীতি সুপ্রাচীন। এছাড়া, কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যে অথবা স্বাস্থ্যবিধির উপকরণ হিসাবে গোবরের বহুল প্রচলন ভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে আছে। অলক্ষ্মীর পূজায় দেবীর গোময়মূর্তি তৈরীর রীতি দেখা যায়।১ আভ্যুদায়িক তথা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানে গোবরের একটি তালকে অনুষ্ঠান-স্থানের দেওয়ালে পঞ্চাঙ্গুলিক চিহ্নিত এবং অন্যান্য সাজে সজ্জিত করে আটকে রাখা অবশ্য কর্তব্য। প্রজনন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, প্রায়শ্চিত্তে পঞ্চগব্যে গোময় ব্যবহার আবশ্যিক। এর কোন ক্ষেত্রেই কিন্তু জমির উর্বরতা বা কৃষি চিন্তার সঙ্গে গোময় যুক্ত নয়! অর্থাৎ, ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে গোবরের সঙ্গে কৃষি চিন্তার সঙ্গে আদৌ সংযুক্তি নেই (টুসু ধর্মীয় তথা সামাজিক পূজা-অনুষ্ঠান)। তা ছাড়া,

---

১। অকাদেমী অব ফোকলোর প্রকাশিত শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের কাঁথির লোকাচার গ্রন্থে দেখা যায়—টুসু ভাসানের দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তিতে মেদিনীপুর অঞ্চলে "খোলা পূজা" হয়। এই অনুষ্ঠানে "গোবর দিয়ে একটি 'বৃষভ' (বা বাসুয়া) তৈরি করে দাঁড করিয়ে দেয়। বৃষভটির পুচ্ছ করে দেয় একটি শাকসুদ্ধ মূলো দিয়ে (পৃঃ ২)। মূলো, মূলোর ফুল টুসু ব্রতের অঙ্গ। Anatomy শাস্ত্রে tail=penis.

অনেকেই হয়তো জানেন যে পূজার জন্য নির্মিত বিভিন্ন প্রতিমা তৈরীতে মাটির সঙ্গে গোবরের ব্যবহার অপরিহার্য (এখন আছে কিনা জানিনা)।

কাঁথি-অঞ্চলে কার্তিক ব্রতে গোবরের শিব তৈরী করার রীতি প্রচলিত আছে (কাঁথির লোকাচার, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঢাকা-অঞ্চলে দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে বধূর কক্ষে যে গর্ভাশয়ের প্রতীক ঢাকনা দেওয়া মালসা স্থাপন করা হয় তার মূল উপাদান গোবর (দীনেন্দ্র কুমার সরকার সম্পাদিত অকাদেমী অব ফোকলোর থেকে প্রকাশিত বিবাহের লোকাচার গ্রন্থের 'বাংলার বিবাহে লোকাচার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কার্তিক ব্রতের শেষ পাঁচ দিনের ব্রত পঞ্চকব্রত নামে কথিত। এর মধ্যে দ্বাদশীতে গোময়ের ভক্ষণের রীতি আছে।

অন্যদিকে 'ষাঁড়ের গোবর' বলে একটি কথা প্রচলিত আছে।—এর অর্থ গো-জাতির পুরুষ শ্রেণীর গোবর শুধু অকেজোই নয়, সে সারবস্তু বিহীন। আমাদের উপরি উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই গাভীর গোবর ব্যবহৃতব্য; ষণ্ড-গোময় লাগেনা। কিন্তু কেন! গোবরের ব্যবহার যদি কৃষিচিন্তা থেকেই এসে থাকে তবে গাভী-ষণ্ড বাছবিচার কেন ?

টুসুব্রতেও এই চিন্তা। এখানেও 'কাড়ুলি বাছুর' অথবা 'যে গরুর বাছুর মরেনি সেই গরুর' গোবরই একমাত্র ব্যবহার্য—একি কৃষিচিন্তা ?

ইতিপূর্বেই আমরা বাংলার জনসৌধ সম্পর্কিত নৃ-তাত্ত্বিক আলোচনার উদ্ধৃতি দিয়েছি। সেখানে দেখেছি, আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে ভারতে যে জন ছিল তারাও এদেশে বহিরাগত। প্রায় সকলেই আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এদেশে এসেছিল। স্বভাবতই তারা নিজেদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাও সঙ্গে এনেছিল। এদের মধ্যে বৈদিক আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যেমন ছিল, তেমনি ছিল অবৈদিক-জনও। বৈদিক আর্যরা যখন এদেশে ইন্দ্রপূজা তথা দেববাদ প্রচারে উদ্যত তখন দেবতা সম্বন্ধে অজ্ঞ এদেশের জনগোষ্ঠী সন্দেহের যে প্রশ্ন তুলেছিল তার প্রমাণ ঋক্‌সূক্তেই আছে। ২৪

পৌরোহিত্যের নিরলস সাধনা লোকবিশ্বাস সঞ্জাত চিন্তাধারাগুলোকে কেমন করে দেববাদে রূপান্তরিত করেছে তার প্রমাণ পাই ভারতীয় আর্য-ভাষাভাষীগোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারের বহু আগে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় গোবর এবং তৎসম্পর্কিত চিন্তা প্রসঙ্গে।

আমাদের দেশে কয়েকজন দেবতা এবং দেবকল্প পুরুষ আছেন, যাঁরা স্বয়ম্ভূ। এঁদের মধ্যে প্রধান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পরমেশ্বর, কামদেব, আদিবুদ্ধ। ২৫ রামায়ণের মতে ব্রহ্মা, কথা সরিৎসাগরের মতে বিষ্ণু এবং শিব স্বয়ম্ভূ। পিতামাতা ছাড়াই এঁদের জন্ম।

ঠিক এমনি একজন স্বয়ম্ভূ দেবতা প্রাচীন মিশরীয় খেপেরা বা খেপ্রি (khepera, khepri, khpr)। ২৬ নিজের নাম উচ্চারণ করেই ইনি নিজের দাঁড়াবার জায়গা করে নিলেন। হস্ত-মৈথুন দ্বারা, নিজের ছায়ার সঙ্গে (আমাদের দেশে সূর্যের অন্যতম স্ত্রীর নাম ছায়া") মিলিত হয়ে, থুথু ফেলে, অশ্রু বর্ষণ করে বায়ুদেবতা 'শু' (shu) এবং জলদেবতা তেফ্‌নাট (Tefnut) কে, এমন কি মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করলেন। পরবর্তীকালে ইনি সূর্যদেবতা Ra-এর সঙ্গে অভেদরূপে কল্পিত হয়েছেন। প্রাতঃ সূর্যরূপে তিনি খেপেরা এবং সায়ং সূর্য হিসাবে আত্মু (Atmu)।

স্বয়ম্ভূই হোন আর সূর্যই হোন, মূলে ইনি গুবরে পোকা। প্রাচীন মিশরে গুবরে পোকাই খেপরা-দেবতারূপে পূজিত হতো। কখনও কখনও নর-দেহে গুবরেপোকা-মুণ্ড সমন্বিত মূর্তিতে খেপরাকে দেখা গেছে। এটি দেবতার মূর্তির মানবায়নের ফল। ঐ অঞ্চলে গুবরে পোকার প্রতি আরও বহুতর উপায়ে শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, আদিম মানুষের লোকবিশ্বাসকেই পৌরোহিত্য, দেববাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়েছে। মিশরের আদিম বিশ্বাসটি ছিল এই রকমঃ লোকে মনে করতো, পিতামাতার সম্পর্ক ব্যতিরেকেই, সূর্যের উত্তাপে গোবর থেকে এই পোকাটির জন্ম হয়েছে (সূর্যের গর্ভাধান ক্ষমতা পরবর্তীকালে বহুভাবে পল্লবিত হয়েছে—প্রথম ঋতুমতী কন্যাকে ঋতুকালে সূর্য-মুখদর্শন করতে দেওয়া হয়না আমাদের মত পৃথিবীর বহু দেশে। সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম ইত্যাদিও তাই)। ইনি অর্থাৎ 'খেপরা' স্বয়ম্ভূ। অন্যদিকে, অনেকেই হয়তো দেখেছেন যে গুবরে পোকা একটি গোলাকার গোময় পিণ্ডকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। মিশরীয় বিশ্বাসে এই পিণ্ড থেকেই পোকা তথা দেবতাটি জন্মেছে।

কিন্তু, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বললে বলতে হয় যে, স্ত্রীজাতির গুবরে পোকা গোবরে ডিম পেড়ে ডিমসহ সেই গোবরের কিছু অংশ ধূলোর আস্তরণ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে গোল করে মাটির গর্তের মধ্যে রেখে দেয়। নরম

গোবরের রস শাবকটির খাদ্য হিসাবে কাজ করে। কিন্তু খাদ্যসংগ্রহকারী আদিম মিশরীয়দের কাছে গুবরে পোকা অতি পবিত্র প্রাণী হলেও তাদের প্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা এর জন্ম-রহস্য আবিষ্কারের আগে এর দেবায়ন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলে গুবরে পোকা হয়েছে স্বয়ম্ভূ দেবতা। ২৭ গোবর তাই প্রজনন-ভূমিস্বরূপে চিহ্নিত। আর প্রসব করবার ক্ষমতা একমাত্র স্ত্রী প্রজাতির আছে বলে ষাঁড়ের পরিবর্তে কাড়ুলি (কুমারী) বাছুর অথবা অ-মৃতবৎসা-গাভীর গোবর তাই পবিত্র।

গুবরে পোকার দেবায়নের পেছনে কল্পনা করা হয়েছে গো-বৎসের প্রজনন ক্ষমতাকে। গোময় গো-দেহের মল। মনুসংসহিতা (৫/১৩৫) যে দ্বাদশটি দেহ নিঃসৃত বস্তুকে (বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাকের কফ, কানের খোল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, পিচুটি, ঘাম) মল নামে চিহ্নিত করেছেন, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র লোকবিশ্বাসে এদের প্রায় সব কটিই জীব-সৃষ্টির উৎস-ভূমি (গোময় এর বাইরে নয়)। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ দেখেছিল আর্দ্র পদার্থ বা স্থান সমূহ জীবের আকর। তাই তারা মনে করল—এই জাতীয় পদার্থ থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। এ বিশ্বাস লুই পাস্তুরের পূর্ব-যুগ পর্যন্ত ছিল।

অন্যদিকে খাদ্যসংগ্রাহক আদিম মানুষের কাছে ফলমূল পশুপক্ষীর মত কীটপতঙ্গও খাদ্য। আজও আরশোলা, গঙ্গা ফড়িং, উকুন জাতীয় প্রাণীরা পৃথিবীর বহু অঞ্চলে মানুষের খাদ্য-তালিকাভুক্ত। এবং যেহেতু খাদ্যপ্রাপ্তির আশ্বাস ছিল আদিম দেবপরিকল্পনার মূলে, তাই { ব্যাঙ (দেবীহেকেৎ), বৃশ্চিক (দেবী সেলকেৎ) এঁরা মিশরের দেবী। দেবী সেলকেৎ নিজের মাথার উপরে বিছে ধরে আছেন। অন্যদিকে হাওড়া জেলার সালকিয়া গ্রামে যে কালিকামূর্তি আছে তার বাঁ পায়ের উপরে আছে একটি "তেঁতুলে বিছে"। ২৮ কালরূপী বৃশ্চিক থেকেই কি কালিকা বা কালী নামের উৎপত্তি হয়েছে? } মূলে ইতর প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত।

মূল খাদ্যের যোগান যখন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন সেই দেবায়িত প্রাণটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় মানুষের বিচিত্র চিন্তাধারা। গুবরে পোকা জাতীর দেবায়িত পতঙ্গ শ্রেণীকে কেন্দ্র করেও এর ব্যতিক্রম হয়নি :

প্রায় আড়াই লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গ গুবরে পোকা শ্রেণীভুক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকার অঞ্চল বিশেষের লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী beetle বা

এই শ্রেণীর পতঙ্গরা বোবা এবং কালা। উলটে গেলে এরা সহজে সোজা হতে পারেনা; তাই এদের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দিলে দেবকৃপায় মুক্তিদাতার দাঁতের ব্যথা সেরে যায়। ঘুনপোকা জাতীয় পতঙ্গ মৃত্যুর সংকেতবাহী। প্রাচীন মিশরের মত আমেরিকার 'চাকো' ইণ্ডিয়ানদের পুরাণ অনুসারে গুবরে পোকা হচ্ছে জগৎস্রষ্টা। আয়ারল্যাণ্ডের দর্ভ-দায়োল (darbhdaol) নামীয় এই পতঙ্গ নানান ধরণের অশুভ সংকেতবাহী। ইংলণ্ডে, জার্মানীতে লাল-কালো বুটিকার বিচিত্রবর্ণের গুবরে পোকা মক্ষী-দেবতা; ঈশ্বরের গাভী নামে পরিচিত। তাদের কাছে এই পতঙ্গ শুভের প্রতীক। একে বলা হয় মহিলাপক্ষী (lady-bird)। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের মূলভূখণ্ডের মেয়েরা এইটিকে ধরে 'বাড়ি যাও' বলে ছেড়ে দাও। তারা মনে করে পোকাটি যেদিকে উড়ে যাবে সেদিক থেকেই আসবে তাদের দয়িত। অর্থাৎ, গুবরে জাতীয় এই পোকাটিকে তারা কামদেবের স্বয়ম্ভু প্রতীকরূপে গ্রহণ করে। ভারতীয় চিন্তায় কামদেবের অন্যনাম স্বয়ম্ভূ—একথা আগেই বলা হয়েছে।

রঙীন গুবরে পোকা শুধু ইউরোপে নয় ভারতেও অভীষ্ট পূরণের দেবতা রূপে পূজিত। টুসুর মত গুবরে পোকাও কুমারীকুলের পূজ্য দেবতা :

"ব-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা। দুর্গা নিজের নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

"কাঁচ পোকা নয়, সুদর্শন পোকা।

"তাহার মুঠার আঁচল আপনা আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়া আছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু দাগ।

"সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ—তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধূলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া, আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বারবার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো...(অবিকল এই-রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা

মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভাল রেখো, মাকে ভাল রেখো, ও পাড়ার খুড়ীমাকে ভাল রেখো,—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর দিদির মত বাজিবাজনা হয়।

"ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধূলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল! দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।" ২৯

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই গুবরে পোকা কাব্যের উপাদান হয়েছে: 'বাংলার আমের পাতাতে/কাঁচপোকা ঘুমায়েছে—' অথবা, 'হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে'।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সুদর্শন ঠাকুরের পরিকল্পনায়, ইউরোপের লেডীবার্ডে, মিশরসহ সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে scarab বা beetle-কেন্দ্রিক দেব পরিকল্পনার মূলে আছে গোবরের স্বয়ম্ভূ-জীব সৃষ্টির আদিম অবৈজ্ঞানিক লৌকিক বিশ্বাস।

এখানেই শেষ নয়, পুরীষের প্রজনন শক্তিতে লৌকিক বিশ্বাস যে কতদূর যেতে পারে, তার অন্যতম উদাহরণ প্রাচীন গ্রীসে এবং অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত ইউরোপের মিস্‌ল্‌টো (mistletoe) সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে এই গাছটি প্রজনন, বিবাহ সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে মূলত যুক্ত। আর রেনল্ডস্‌ মনে করেন—মিস্‌ল্‌টো-র পবিত্রতা এবং উর্বরতা-শক্তির পেছনে আছে এর জন্ম-ইতিহাস। পাখিরা কোন গাছের ডালায় মলত্যাগ করলে তারই উপর মিস্‌ল্‌টো জন্মায় আর এর জন্যই এর প্রজনন ক্ষমতা এত বেশি।৩০

পুরীষ সম্পর্কিত আদিম লোকবিশ্বাস গোময়ের ক্ষেত্রে কেমন করে কীভাবে এসেছে তা আমরা দেখলাম। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত টুসুব্রতে গোবরের ব্যবহার এই জন্যই। গোবরের, বিশেষ করে স্ত্রী-প্রজাতির গোবরের সম্পর্ক মূলে কৃষিকর্মের সঙ্গে নয়; জীব সৃষ্টি তথা প্রজনন চিন্তার সঙ্গে যে যুক্ত ছিল, উপরিউক্ত আলোচনাই তা প্রমাণের তথ্য সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় উপাদান তুষ। নবান্নের তুষ দিয়ে টুসুর সরা ভরা হয়। যেহেতু তুষ বলতে এখন আমরা কেবলমাত্র ধানের খোসাকেই বুঝি, তাই তুষ বা টুসুকে কৃষি উৎসব বলি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাব, তুষ কেবল

মাত্র ধানের খোসাই নয়। তুষ শব্দের আভিধানিক অর্থ ধান্যত্বক্। কিন্তু ধান্য আবার পাঁচ রকম (আমাদের উৎসবে পঞ্চশস্য লাগে): শালিধান্য (রক্তশাল্যাদি), ব্রীহিধান্য (ষষ্টিকাদ্য), শূক ধান্য (যবাদি), শিম্বীধান্য (মুদ্‌গাদি), ক্ষুদ্রধান্য (কঙ্গু ধান্য)।৩১ তাই তুষ বললে কেবলমাত্র তণ্ডুল মাতার খোসাকেই বুঝবার কোন হেতু নেই। যেকোন শস্যের খোসাকেই তুষ বলা যায়। এখন যেহেতু বাঙালীর প্রধান খাদ্য তণ্ডুল, তাই তার খোসাকেই মূলত তুষ নামে অভিহিত করা হলেও কলাই, তিল, যব ইত্যাদির তুষ বা ভুষি কথাগুলো এখনও প্রচলিত।

শস্য মাত্রেরই আবরণ বা তুষকে কেন টুসু-সরার গোবরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে? দানা শস্যের খোসা যেহেতু ব্যবহৃত তাই টুসু কৃষি উৎসব এমন চিন্তার অবকাশও বোধহয় নেই। প্রতিমা তৈরীতেও গোবরের মত তুষ লাগে এক-মেটে করবার সময়। যে কুমারী মৃত্তিকা (পোড়া না হলেই মাটি কুমারী থাকে—আর এই জন্যই আমাদের মূর্তি হয়, পূজার জন্য কাঁচা-মাটির, পোড়ামাটির নয়) মূর্তি গড়ে তাতে তুষ মেশাতে হয় গোবরের মতই। কেন?

আগে দেখেছি গোময়ের ব্যবহার প্রজনন চিন্তা থেকে। টুসুব্রতের পিঠায় তিল অপরিহার্য। ধানের মতই তিলের খোসাও তুষ। অন্যদিকে পিঠায় যেমন খোসা ছাড়ানো তিল লাগে তেমনি সরষের ফুলও লাগে টুসু উৎসবে।

তুষ অথবা ভুসির ব্যবহার বুঝতে হলে আমাদের পূজা বা পারলৌকিক ক্রিয়াকার্যে তিলের ব্যবহারকে বোঝা প্রয়োজন। তিল শুধু আমাদের দেশে নয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ প্রাচীন গ্রীস-রোম প্রভৃতিতে প্রজনন কেন্দ্রিক উৎসবগুলিতে (ভেনাস, কোর অথবা ডিমেটার-এর উপাসনায়) নারীর দেহের প্রজনন ভূমির আকৃতি বিশিষ্ট পিঠা তৈরী করা হত (টুসু উৎসবে ব্যবহৃত গড়গড়্যা, ছবরি ইত্যাদি নামীয় পিঠেগুলি কোনকালে বা কোন অঞ্চলে ঐ ধরণের আকৃতি বিশিষ্ট ছিল বা আছে কিনা তা দেখা দরকার)। গ্রীসে তিন দিনের থেসমোফোরিয়া উৎসবের ঐ পিঠের অন্যতম উপাদান থাকত তিল।৩২ আমাদের দেশেও মোদক তৈরীতে তিল প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষেত্রে। তিলুড়ি বা তিলে কদমা পূজার উপকরণ এদেশে।

আর এই তিলের তুষকে এবং বস্তুটিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রজনন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বাৎসায়নের কামসূত্রে বলা হয়েছে যে তিল বিশেষ করে তার তুষ বা ভুসিকে চড়ুয়ের ডিমে ভিজিয়ে দুধ, চিনি, ঘি এবং আরও দু-একটা জিনিসের সঙ্গে সেদ্ধ করে খেলে অসংখ্য কামিনী-উপভোগের সামর্থ্য আসে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর আরব-চিকিৎসক কস্তা বেন লুকা বলেন যে, কোন লোক পুরুষত্ব-বিহীন হলে সে যদি কাকের পিত্তরসের সঙ্গে তিল মিশিয়ে গায়ে মাখে তবে তার প্রজনন-ক্ষমতা ফিরে আসবে। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা তিনি দেখেছিলেন Book of Cleopatra-তে। প্রাচীন মিশর সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তিলের এই প্রজনন কামনাবর্দ্ধক গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। ৩৩ তাই বিভিন্ন প্রজনন কেন্দ্রিক উৎসবে এদের ব্যবহার করেছে।

ধান্য (ব্যাপক অর্থে) তুষ গোবরের মতই প্রজনন চিন্তা থেকেই ব্যবহৃত। তিলের মত সরিষার ব্যবহার ও একই কারণে। এটি যৌন উত্তেজনা বর্ধন কারী। পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীস এবং ভারতবর্ষ মনে করতো যে মধু বা তেলের সঙ্গে সরষে বীজ মিশিয়ে ব্যবহার করলে গর্ভ নিরোধ হয়। ৩৪

টুসু উৎসবে তিলের ব্যবহার, তুষের ব্যবহার, গানে তিল ফুলের আবির্ভাব এই জন্যই, আর এই একই কারণে করবী, বাসক, তিল ফুল টুসুগানে এসেছে।—

নদীর ধারে তিল বুনলম ছোটবড হয় গুটি।
ভালো করে বুনবে তাঁতী লাত জামাইয়ের কোড ধুতি।

আট চালা চণ্ডীমেল্লা বাসক ফুলের বিছানা।
ঝিরি কেটে জল ঢুকল ভিজল তুষুর বিছানা॥

মায়ে দিল মাথা বেঁধে দেগো মামী ফুল গুঁজে,
তোদের জামাই দাঁড়িয়ে আছে করবীর ডাল ধরে।

মনে রাখা দরকার তিল পৌষের ফসল নয়, তবু টুসু গানে এসেছে। আরও একটি কথা—এখন মূলত ধানের তুষ ব্যবহৃত হলেও কোন অঞ্চলে অন্য শস্যের তুষ ব্যবহৃত হয় কিনা বা অতীত হতো কিনা, এ ব্যাপারে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তুষের বৈশিষ্ট্য যেভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ধরা পড়েছে তাতে মনে হয়—এরকম ব্যবহার ছিল।

গোবরের নাড়ুর সঙ্গে দূর্বা ব্যবহারের রীতি আছে। টুসু সরায় এটি অপরিহার্য অঙ্গ। দূর্বা, শুধু টুসু উৎসবে নয়, বাংলার প্রায় যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দূর্বাকে ত্রিপত্র করে ব্যবহারের রীতি আছে। সৃষ্টি-দেবতা শিবের পূজায় দূর্বাকে 'কোঁক'—মুক্ত করে দিতে হয়। প্রজননের দেবী ষষ্ঠীর পূজায় ষাটগাছি দূর্বা লাগে। বাংলার মেয়েরা ব্রতকথা শুনতে ধান-দূর্বা হাতে নিয়ে বসেন। বিপত্তারিণীব্রতে তের-গ্রন্থি যুক্ত রক্ত ডোরকের প্রতি গ্রন্থিতে একটি করে ত্রিপত্র দূর্বা ব্যবহৃত হয়। বিবাহের বর-কনের হাতে যে হরিদ্রাসিক্ত ডোরক বাঁধা হয় তাতে দূর্বা অপরিহার্য। কিন্তু দূর্বার এত ব্যবহার কেন?

এর জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে ভবিষ্য-পুরাণ বলছেন যে, সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু তাঁর বাহু ও জঙ্ঘা দ্বারা মন্থন-দণ্ডটিকে ধারণ করেন। ঘর্ষণে লোমরাজি উৎপাটিত হয়; তা থেকেই দূর্বার জন্ম। উক্ত পুরাণ মতে ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে দূর্বাষ্টমী ব্রত করতে হয়। "এই ব্রতের প্রসাদে সপ্তপুরুষযাবৎ সন্ততি ক্ষয় হয় না।" কিন্তু দূর্বাব্রত কাদের করণীয়? ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি বলছেন, "দূর্বাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যা করোতি পতিব্রতা। ন তস্যাঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানং সাপ্তপৌরুষম্॥" দূর্বার উপাসনা করবেন সন্তান-কামনায় পতিব্রতা রমণীকুল। কিন্তু কোন গুণের অধিকারিণী দূর্বা?

শিবকালী ভট্টাচার্য বলছেন: বাহ্যদৃষ্টিতে ধান বা যব যেমন প্রাণ উজ্জীবনের সম্পদ তেমনি দূর্বাও হচ্ছে প্রজাস্থাপনের (fecund) বা জননীয় উপাদান। বাজসনেয়ী (শুক্ল যযুর্বেদে ১৩।২০) সংহিতায় দূর্বার উল্লেখ আছে।

যেকোন করাণেই হোক, গর্ভ ধারণে অসমর্থ হলে অথবা মৃতবৎসা হলে (জীবিত সন্তান প্রসূত না হলে) সেক্ষেত্রে দূর্বাও আতপচাল একসঙ্গে বেটে বড়া বা ফুলুরি করে সপ্তাহে ৩।৪ দিন ২।৩টী করে ভাত খাওয়ার সময় কিছুদিন খেলে সে অভাব থাকবে না বা গর্ভদোষ নষ্ট হবে। এ ভিন্ন অকালে রজঃরোধ অথবা অধিক বয়স পর্যন্ত রজঃ অদর্শনে এইভাবে ব্যবহারেও ফলপ্রসূ হয়।৩৫

দূর্বা ব্যবহার এবং তার পূজা-অনুষ্ঠানের পেছনে আছে নারীর সন্তান কামনা। এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-মতে সেই কামনা পূরণের ক্ষমতা দূর্বার আছে। বিষ্ণুরোমের কাহিনী রূপকমাত্র।

ভেষজগুণের জন্য দূর্বা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু, তাকে ত্রিপত্র করে পূজায় ব্যবহারের রীতির পেছনে যুক্তি কি? (সকলেই জানেন দূর্বার প্রতিগ্রন্থিতে থাকে পাঁচটি করে পাতা)। দূর্বার ভেষজগুণ গর্ভদোষ নষ্ট করা। অন্যদিকে গর্ভের বহিরঙ্গের আকৃতি বিশিষ্ট করে তোলাই দূর্বাকে ত্রিপত্র করার পেছনে উদ্দেশ্য (এই প্রসঙ্গে ও. এ. ওয়াল লিখিত সেক্স্ এ্যাণ্ড সেক্স্‌ওয়রশিপ গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে প্লাস্টার অব প্যারিসে তোলা একটি শিশুকন্যার জননাঙ্গের ছাপের ছবি আছে। সেটি অবিকল দূর্বার আকৃতি-বিশিষ্ট। এ ছাড়া, একই আকৃতির ত্রিশূল যে ঐ রকম এবং উর্বরতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত একথা পাশ্চাত্য-গবেষকরাও স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত ত্রিপত্র বিল্বপত্রের আকৃতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে)।

টুসুব্রতে দূর্বার ব্যবহার হয়েছে এইদিকে লক্ষ্য রেখেই। চাল বা চালের-গুড়ির ব্যবহারের উদ্দেশ্যেও শ্রীভট্টাচার্যের লেখা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে (টুসু-সরায় পিটুলির ব্যবহার আছে)। চাউল সব অঞ্চলেই পুরুষের সৃষ্টি বীজের প্রতীক।

এরপর তুলসী। তুলসী প্রতিটি হিন্দু, বিশেষ করে বৈষ্ণবের কাছে অতিপবিত্র। তুলসীর স-শ্বেতচন্দন পত্র নারায়ণ বক্ষে ধারণ করেন। কিন্তু, কী কারণে আমাদের পূজায় তুলসীর এত প্রতিষ্ঠা? বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে তুলসীর মাহাত্ম্য-মূল নির্দেশ করা যেতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, আদিতে তুলসী শ্রীরাধার সহচরী। কৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীর অন্তরঙ্গতা ধরা পড়লে রাধিকার অভিশাপে একই নামে তুলসী ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এবং শঙ্খচূড়ের স্ত্রী-অবস্থায় নারায়ণ এর সতীত্ব নাশ করেন শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশ। পরে নারায়ণের বরে তুলসী তাঁর প্রিয়া হয়ে সান্নিধ্য লাভ করে। পদ্মপুরাণেও বিষ্ণুকর্তৃক জলন্ধর-পত্নী বৃন্দানাম্নী তুলসীর সতীত্বনাশের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে।৩৬

প্রেমধর্মের পূজারী বৈষ্ণবদের কাছে তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া; তাই পবিত্র। কিন্তু উভয় কাহিনী অনুসারেই তুলসীর সতীত্বনাশের ঘটনা মুখ্য। অর্থাৎ, তুলসীপত্রের কামোত্তেজনাগুণ আছে বলেই সে আদৃত। এটি প্রজননের গুল্ম হিসাবে চিহ্নিত। এগুল্ম স্বর্গের দ্বার খুলে দিতে পারে।৩৭

তুলসীসম্পর্কে এই ধারণা শুধু এদেশেই নয়, মধ্যপ্রাচ্য অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই একই ধরণের চিন্তা। ইতালীতে তুলসী প্রেমগুল্ম। প্রাচীন গ্রীসে সম্ভবত এটি রাজকীয় উৎসবে ব্যবহৃত হত। গ্রীক অথবা রোমীয়রা বিশ্বাস করত যে অভিশাপ বা গালাগাল না দিলে তুলসী-গাছ বড় হয়না। তাই তুলসী রোপণের সময় তারা গালাগাল দেন।

গ্রীসে কনের পিতা বরের বাবা অথবা নিকট আত্মীয়কে (অথবা এর উল্টোটা) থালায় তুলসী দেন বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করবার প্রতীক হিসাবে।

ভারতের মত পারস্য এবং মিশরের শ্মশানে (শবশয়ন স্থানে) তুলসীর ব্যবস্থা দেখা যায়। মোলডাভিয়াতে তুলসী সম্পর্কে একই প্রেমের ধারণা। মন্ত্রপূত তুলসীমঞ্জরী ভবঘুরে তরুণের বাউণ্ডুলেপনার অবসান ঘটাবে। এবং যে তরুণী তার হাতে তুলসীমঞ্জরী দেবে তরুণটি তাকে ভালবাসবে (আমাদের দেশে তুলসীচয়ন নির্দেশে বলা হয়েছে "মঞ্জরীবৃন্তসহ তুলসী-পত্র চয়ন করিবে। তুলসীপত্র চয়নকালে যদি শাখা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করা হয়।—পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভগ্না শাখা যদা ভবেৎ। তদা হৃদি ব্যথাবিষোদ্দীয়তে তুলসীপতেঃ")। ৩৮

তুলসীর নারায়ণ বা বিষ্ণুপ্রিয়া হবার কাহিনীর পেছনে লৌকিক উপাদান হলো কাম চিন্তা। কিন্তু, ইউরোপে এই গুল্মটিকে কেন্দ্র করে আছে একনিষ্ঠ প্রেমের করুণ কাহিনী ঃ

ফ্লোরেন্সের তরুণী ইসাবেলা। তার ভাইয়েরা একদিন আবিষ্কার করল যে, ইসাবেলা লরেঞ্জো নামে এক তরুণকে ভালবাসে। একদিন তারা তরুণটিকে ভুলিয়ে বনে নিয়ে হত্যা করল। দেহটি মাটিতে পুঁতে রাখলো। ইসাবেলা খুঁজে খুঁজে মৃতদেহ বার করে তার মাথাটী এনে পুঁতে রাখলো টবে। আর তাতে রোপণ করল প্রেমগুল্ম তুলসীর একটি চারা। অতি যত্নে সেটিকে সে লালন করে। মাঝে মাঝে পাশে বসে নীরবে চোখের জল ঝরায়। ভাইদের সন্দেহ হলো। টবটি নিয়ে গিয়ে তারা দেখলো যে তাদের কুকর্ম ধরা পড়েছে। নগর থেকে পালালো তারা। এদিকে ভগ্ন-হৃদয় ইসাবেলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

এই লোক-কাহিনী অবলম্বন করেই ডেকামেরনে (Decameron/IV/5) বোকাসিও-র একটি গল্প এবং কীট্‌স্‌-এর একটি কবিতা (Issabela, or The Pot of Basil, 1820) আছে। ৩৯ আমাদের দেশে তুলসীর বিবাহ

অনুষ্ঠানের রীতি আছে নতুন পুকুর কাটলে। তুলসীকে কেন্দ্র করে শুধু প্রেমের কাহিনীই নেই; রান্নার কাজেও এটি ব্যবহৃত। তুলসীর গন্ধ হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী; এটি আনন্দ বিধায়ক।

সিন্দুর, পঞ্চাঙ্গুলিক এগুলি প্রজনন চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত (পঞ্চাঙ্গুলিকের বিস্তৃত আলোচনা আছে মৎপ্রণীত মানবসভ্যতায় কুমারী বলি [প্রবন্ধে])। সবুজ দাগটি অনেকের কাছেই সবুজ শস্যের প্রতীক বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মাতৃকামূর্তিকে সবুজ রঙে রং করার রীতি আমরা দেখতে পাই লিবিয়ায়। সেদেশের দেবী নীথ (Neith) এর মুখ-মণ্ডলকে সবুজ করা হতো। এঁর আয়ুধ হচ্ছে ত্রিশূল, ধনুর্বাণ। ইনি প্রজননের দেবী। ৪০ গ্রীকদেবী ডেমেটারের প্রধান উৎসব থেসমোফোরিয়া (আগেই উল্লিখিত) এবং এলুসিনিয়া (Eleusinia)। ক্রীট থেকে আট্টিকা, এশিয়া থেকে ইতালীতে পূজিতা এই দেবীর বর্ণ দুটি—সবুজ এবং হলুদ। প্রাপ্তরূপে তাঁকে শস্যের দেবীরূপে বলা হলেও মূলে তিনি ছিলেন উর্বরতার দেবী। ৪১ ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাও'তে হোমারের 'হি-উম্ টু ডেমেটার'-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দেবীকে শস্যদেবী রূপে চিহ্নিত করলেও ৪২ মেকেঞ্জি বলেছেন যে এমন কিছু কিছু দিক মাতৃকা-উপাসনায় আছে যেগুলির জন্ম শিকারমূলক স্তরের। ৪৩ তাই যদি হয়, তবে দেবীদের জন্ম তখন বা তারও আগে। অতএব সবুজ শস্যের নয়, নব তারুণ্যের প্রতীক। এই সবুজ রংটি পূর্ববঙ্গে বরণকুলোতে রাখা 'উলানি পুলানি'র একটিতে দেওয়া হয় (সাদা, সবুজ, হলুদ এবং লাল, কালো—এই পাঁচ রঙের 'উলানি পুলানি থাকে)। আধুনিককালে দোলে সবুজ আবীর প্রচলিত। দোল শস্যোৎসব নয়, বসন্তোৎসব। স্কটল্যাণ্ডের চিরবসন্তের প্রাণী পরীসম্পর্কিত একটি রূপকথায় সবুজ-কাজলের কথা আছে। বসন্তের রঙ হিসাবেই সবুজকে ব্যবহার করেছিল প্রাচীন যুগের মানুষ এই—চিন্তাই বেশি যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ সভ্যতার শিকারমূলক স্তরে বসন্তের আগমন-সংকেতবাহী ছিল বৃক্ষপত্রের সবুজ বর্ণ। এই রঙ দেখলেই সে বুঝতো, পশু পক্ষীকুলের মিলন ঋতু আসন্ন, শিকার প্রাপ্তির আশা উজ্জ্বল।

ঘট বা কুণ্ডের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় এটাই সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কৃষি নয় কুমারী তথা নারীসমাজের সন্তান কামনার বিভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে টুসুতে। এ ছাড়া, ঘট বা কুণ্ড বা সরা যে গর্ভাশয়ের প্রতীক একথা সর্বজন স্বীকৃত।

পূজার অর্ঘ্য-উপকরণের মধ্যে মূলা বস্তুটি অনেকেরই সবিস্ময় জিজ্ঞাসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত অর্ঘ্যরূপে মূলো বা মুলোর ফুল ব্যবহারের রীতি কোন মেয়েলি ব্রততে না দেখা গেলেও অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন কালীমন্দিরে পৌষমূলো দেবার রীতি আছে (পৌষ টুসু উৎসবের মাস)। এছাড়া বার মাসে যে তেরষষ্ঠীর পূজো হয়, তার মধ্যে পৌষ ষষ্ঠীর নাম মূলকরূপিনী বা মূলাষষ্ঠী। রসনা-তৃপ্তি কারক এই বস্তুটির তাৎপর্য জানতে বা বুঝতে হলে মূলা শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তা জানা দরকার। মূলা বা মূলকের আভিধানিক অর্থ কন্দাকার খাদ্যভেদ। এতে কচুকেও যুক্ত করা হয়েছে। আবার যে কোন খাদ্য মূলকেই 'মূলা' বলা হয়েছে। এই বিভিন্ন দিকের প্রতি অভি-ধানের ইঙ্গিতই প্রমাণ করে যে বর্তমানকালে যে সব্জীকে আমরা মূলো বলি সেই বস্তুটিকেই কেবল ঐ বিশেষ নামে চিহ্নিত হতনা। স্ফীত-মূল এবং মূলই প্রধান ভক্ষ্য সে সব্জীর তারা সকলেই মূলো নামে চিহ্নিত হত; এমন কি কচুর গোড়াটি যেহেতু কন্দাকার তাই তাকেও অভিধান মূলার দলে ঠেলেছে।

কচুকে বাদ দিলে পরিচিত মূলার আকৃতি বিশিষ্ট তিনটি সব্জী চোখে পড়ে। এরা আমাদের পরিচিত মূলা (radish), গাজর ও বীট। এর মধ্যে গাজরের সঙ্গে পরিচয় এদেশের মানুষের অন্তত সংহিতার যুগ থেকে। মনু-সংহিতায় (৫.৫), বশিষ্ঠ সংহিতায় (চতুর্দশ অধ্যায়) গৃঞ্জন নামে বস্তুটির উল্লেখ আছে। এই যুগে অন্যান্য উত্তেজক বস্তুর সঙ্গে গাজরের ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; পক্ষান্তরে তান্ত্রিকদেবী কালিকাকে পৌষমূলো উৎসর্গের রীতির সঙ্গে, প্রজননের দেবীর ষষ্ঠীর পৌষালি পূজার নাম মূলা ষষ্ঠী করায় এই চিন্তা আসে যে মূলা জাতীয় সব্জী এক সময় প্রজনন চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত ছিল।

চিরঞ্জীব বনৌষধি-র মতে মূলা এবং গাজর উভয়েই উষ্ণবীর্য। এছাডা, মাসিক ঋতুস্রাব হওয়ার প্রাক্কালে কোমরে বা তলপেটের অসম্ভব যন্ত্রণা এবং স্রাবের স্বল্পতা, কোন কোন সময় মাথায় যন্ত্রণা, মুখেও অরুচি,—এই অবস্থায় পড়লে মূলার বীজচূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম জলসহ সকালে ও বৈকালে খেতে হবে।

ভারতীয় বনৌষধি গ্রন্থের মতেও : মূলা ও গাজর প্রায় সমধর্মী। গাজর

কামোদ্দীপক, ধাতু দৌর্বল্যে রসায়ন, গর্ভ-যন্ত্রণায় উপকারী। বীজ স্নায়বিক দৌর্বল্য নাশক ও বলকারক। ইহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে গেঁজাইয়া একপ্রকার মদ প্রস্তুত হয়। পত্র ও বীজের ক্বাথ সেবন করিলে গর্ভবেদনা বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায়।

মূলা কটুরস, উষ্ণবীর্য। গৃঞ্জনক নামক মূলাকে গাজর বলে। ৪৪

পাশ্চাত্য জগতে মূলা (horse-radish) গো-মাংসের কাবাবের সঙ্গে চাটনির মত ব্যবহৃত। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বরিশাল অঞ্চলের মানুষ কচ্ছপের মাংসের সঙ্গে আলুর পরিবর্তে মূলাকে ব্যবহার করেন।

পৌষে যে মূলা ষষ্ঠী হয় তাতে পূজার আসনে গোটা মূলা দেওয়া হয় (টুসু ব্রতে 'খোল-খসা' মূলা দেওয়া হয়)। অন্যদিকে, পঞ্জিকায় চতুর্থী তিথিতে মূলাভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চতুর্থী তিথির নক্ষত্র রোহিণী। পৌরাণিক দৃষ্টিতে রোহিণীকে কেন্দ্র করে চন্দ্র-রোহিণী এবং প্রজাপতি-রোহিণীর যে দুটি কাহিনী আছে তাদের এক কথায় aphrodisiac বলা যেতে পারে। এ ছাড়া, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরটি নক্ষত্র ধরলে পরবর্তী চতুর্থীর নক্ষত্র মূলা, আকৃতি সিংহপুচ্ছ বা লাঙ্গুলের মত (লোকশ্রুতিতে লিঙ্গ-লাঙ্গুল অভেদ)। সায়ণাচার্য এই নক্ষত্রটিকে ব্যাধির নিদান বলেছেন (রোহিণীচন্দ্রের কাহিনীতে চন্দ্রের ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হবার কথা আছে)। 'মূলা' নাম, এর আকৃতি-কল্পনা, লাঙ্গুল বলা এবং রোহিণী সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীর aphrodisiac বৈশিষ্ট্যের ৪৫ সঙ্গে মূলার প্রাচীনকালে কোন ধরণের সম্পর্ক ছিল, তা গবেষণার বিষয়।

মূলা-এর সংস্কৃত নাম মূলক। ইংরাজীতে Moly নামে একটি শব্দ আছে। অভিধানকার মূলম্ এর সঙ্গে moly কে অভেদ চিন্তা করেছেন। এই 'মলি' কোন বস্তু এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগৎ নিঃসন্দেহ নয়। হোমার বলেছেন এর ফুল সাদা (মূলার ফুল সাদা)। প্লিনির মতে এটির গাত্র-বর্ণ সাদা (সাদা মূলা আছে)। পরবর্তীকালে 'মলি'কে ম্যানড্রেক (man-drake) বলা হয়েছে। কেউ কেউ একে বলেছেন রসুন (উত্তেজক বলে সংহিতার যুগে রসুন ও গাজর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নিষিদ্ধ)।

ম্যানড্রেক জাতীয় মূলার সঙ্গে বহু বিচিত্র সংস্কার জড়িয়ে আছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এই ফসলটির মূলের তলার দিক আমাদের দেশের মূলার মতই অনেক সময় মানুষের পায়ের মত দুভাগে বিভক্ত হয় বলে এবং

অন্য কারণে একে ম্যান অথবা উওম্যানড্রেক বলা হয়। এটি মূলার মতই উষ্ণ বীর্য। লোকবিশ্বাসে ম্যানড্রেক খেলে গর্ভ হয়; হাতির কামোত্তেজনা বাড়ে ম্যানড্রেক খেলে, এটাও লোকবিশ্বাস। গ্রীসের কোন কোন অঞ্চলে এখনও তরুণেরা ম্যানড্রেকের প্রেমদায়িনী শক্তি আছে—এই বিশ্বাসে এর এক টুকরো সঙ্গে রাখে। ৪৬

উপরে আলোচিত টুসু ব্রতের বিভিন্ন উপকরণের সবগুলিই প্রজনন চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে এটিকে বসন্তোৎসব চিন্তা করা অমূলক নয়।

এ দিকগুলি ছাড়া টুসু প্রতীকের আরও একটি দিক আছে। তা হচ্ছে 'আলোখলা' (খোলা) বা দীপাধার। খোলা এবং মালসা বা সরা অভেদ। এই রকম দীপাধার ব্যবহৃত হয় বাংলার বাইরে টেসু উৎসবে। ৪৭ সেখানে এই টেসু উৎসবের অন্য নাম 'ছলা' (Chhala)। এই দীপাধারকেন্দ্রিক উৎসবে মেয়েরা যেমন যোগ দেয়, ঠিক তেমনি ছেলেদেরও এটি উৎসব (বাংলার টুসু-উৎসবে মেয়েরা নেয় দীপাধার, ছেলেরা করে বহ্ন্যুৎসব, তারা ম্যাড়া-ঘর পোড়ায়)।

প্রথমেই বলা দরকার টুসুর মত টেসু কিন্তু পৌষালি উৎসব নয়। এটি নবরাত্রি এবং দশেরা উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু টেসুর মত টুসুতেও টুসুর সাধ ভক্ষণের (বা বিয়ের) উপাচার সংগ্রহের গানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন মাগবার রীতি পরিলক্ষিত হয়। টুসু-খলা এবং টেসুর প্রদীপাধার মূলে একই। টুসু-উৎসবে ছেলেদের জ্বালানো বহ্ন্যুৎসবের আগুনে অথবা 'ছবরি ঘুঁটে'র আগুনে ব্রতিনীদের আগুন পোহানো, দোলের (বসন্তোৎসবের) আগে চাঁচরের আগুন, অলক্ষ্মী পূজায় অঞ্চল বিশেষে 'ভুর' পোড়ানো, পূর্ব-বাংলায় কার্তিক পূজোর দিন 'ভোল ওড়ানো' ইউরো-আমেরিকার মে-পোল বা বেলটেইন উৎসবে বহ্নিপ্রজ্জ্বালন-সবগুলিই উর্বরতা-অনুষ্ঠান।

'শিব রাত্রির সলতে' একটি প্রচলিত কথা। এর পেছনে যে লৌকিক আচারের যে অনুষঙ্গ আছে তা হলো ব্রতিনীদের কাছে শিব উপাসনার রাত্রি জাগরণের রাত্রি। উপাসিকরা ঐদিন প্রত্যেকেই নিজের প্রতিটি সন্তানের জন্য একটি করে এবং নিজের নামে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালে। প্রতিটি প্রদীপই যাতে সারারাত অনির্বাণ জ্বলে সেদিকে ব্রতিনীরা সচেতন দৃষ্টি রাখেন। এবং বেলগাছের কাছে গিয়ে প্রত্যেক সন্তানের নাম করে এক একবার বেল গাছটিকে ঝাঁকুনি দেন।

প্রদীপ যে প্রজনন চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তা এই লৌকিক অনুষ্ঠানে থেকেই বুঝা যায়। পরবর্তীকালে প্রদীপ শিখায় রূপান্তরিত হলেও মূলে যে বহ্ন্যুৎসবই ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন আসরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।

ইজরাইলের রমনীকুল তমমুজের জন্য অশ্রু বিসর্জন করত। তারা মাতৃকাদেবীদের উদেশ্যে পিঠা উৎসর্গ করত (টুসুতেও পিঠার ব্যবহার লক্ষণীয়)। সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই মেয়েদের আচরণ রক্ষণশীল। পুরুষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো মেয়েদের মধ্যে থেকে যায়। জেরেমিয়ার সাক্ষ্যে দেখা যায় যে সুপ্রাচীন অনুষ্ঠানগুলোতে পুরুষেরাও যোগ দিত। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিতে পুরুষ প্রজননদেবের অভিনয় করতো। অন্যদিকে নারীর ভূমিকা ছিল সৃষ্টি-ধারণের দেবীর। এরই স্বীকৃতিতে দেবীকে পিষ্টক উৎসর্গ। অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতি নবজাত সন্তান। তাই শিশুরা বহ্ন্যুৎসবের আযোজন করত। ৪৮

এই রীতি পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতার। সুপ্রাচীন সংস্কার এবং অনুষ্ঠান-গুলি আজও আছে। কেবল কাল প্রবাহের ফলে এদের ব্যবহারবিধি এবং সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র-রকম হয়েছে মাত্র। টুসু উৎসবের বিভিন্ন অঞ্চলের আঙ্গিক উপকরণ অনুষ্ঠানে এই সত্যই ধরা পড়বে।

টুসু উৎসবের অন্যতম উপকরণ চৌডল বা চোদল। এইটি আনীত হয় উৎসবের শেষের দিকে। প্রায় সকলেই একে চতুর্দোলা বা পালকী বলেছেন। একটি গানে একে ভাঙা পাল্‌কী বলা হয়েছে।

সারা রাজ্যে কোকিল ডাকে তিষুমাকে ভুলাতে।
ভুলনা ভুলনা তিষু ভাঙা পাল্‌কী এসেছে॥

চৌড়ল যদি পালকী হয় তবে তার বাহকের হাতল কোথায়? মিশরীয় সভ্যতায়ও পালকী ছিল। তাও কিন্তু হাতল-মুক্ত নয়। চৌড়ল চতুর্দোলা বা পালকী নয়। এটী চতুষ্কোণ বিশিস্ট মন্দির। অন্তত একটী গানে তাই বলা হয়েছে।

পোষ মাসে তুষু তুলল্যম, চন্দন কাঠের চৌদল্লা
একা মন্দির, দুয়া মন্দির, তিনা মন্দির ঠেকেছে,
এতবড় গাঁয়ের রাজা দালাল দিতে লেরেছে।...

চৌড়ল চতুষ্কোণাকৃতি মন্দির। কিন্তু চতুষ্কোণ কেন?—রাঢ় বাংলা বা তৎসন্নিহিত এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যে শৈব মন্দির সমূহ আছে, অথবা

উড়িষ্যার লিঙ্গরাজের মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দির যাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে শৈব মন্দির সবগুলোই মূলত চতুষ্কোণাকৃতি। তাছাড়া আধুনিককালে টুসু ভাসান নদী বা বৃহৎ জলাশয় হলেও এককালে এ উৎসব হতো প্রান্তরে (এইসব প্রান্তরে চতুষ্কোণাকৃতি লক্ষ করা যায়)।

টুসু ভাসান/পরব টাঁড়ে/টুসুর গানে/মন মাতে। টাঁড় শব্দের অর্থ প্রান্তর। চতুষ্কোণাকৃতি মন্দির কেন তৈরী হয়েছিল ?—এ প্রশ্নের জবাবে এখানে শুধু বলছি যে, যে দৃষ্টিভঙ্গীতে চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তির পরিকল্পনা, যে দৃষ্টিকোণে চতুর্দল বা চৌড়ল বা বৃষকাষ্ঠ (শ্রাদ্ধের) তৈরী হয়, যে ঐতিহ্য-সূত্রে বীরস্তম্ভগুলি তৈরী হয়েছে তার মূল সুদূর অতীতে এবং একাধিক সভ্যতা-ব্যাপক। এই চৌডল চতুর্মুখ লিঙ্গ মূর্তির অন্যতর সংস্করণ। থেসমো-ফোরিয়া উৎসবের মত, দুর্গাপূজার মত, টুসুও মূলে তিনদিনের উৎসব ছিল, যার রেশ আজও মেদিনীপুরের অঞ্চল বিশেষের উৎসবে আছে। দুর্গাপূজার ভাসান বিজয়া দশমীতে, সেই দিনই শিবের উপস্থিতি। টুসুতেও ভাসানের দিন এই চৌড়লে বসিয়ে টুসুর ভাসান হয়। শিবের সঙ্গে মিলনে যেমন দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ও প্রতিমার বিসর্জন ঠিক, তেমনটিই হয় টুসু উৎসবে। বিসর্জনের আগের দিন টুসুর সাধ (কোথাও বিবাহ)। আরও গবেষণা করলে চৌড়লগুলি যে শিবমন্দিরের (আরও অতীতে শিবের) প্রতীক ছিল তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

চার ঃ

এতাবৎ আলোচনায় দেখেছি টুসু উৎসব মূলত সন্তান কামনার উৎসব। কিন্তু 'টুসু' কোন্ দেবতা ? এই নামটির সৃষ্টি কেমন করে ?

টুসু নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদগুলি আছে তারা হলো পৌষের নক্ষত্র তিষ্যা বা পুষ্যা থেকে তিষু বা তুষু বা টুসু। উষা বা ওষা থেকে তুষু বা টুসু এসেছে এমন কথাও কারো মুখে শোনা যায়। কেউ বলেছেন তুষ থেকে তুষু বা টুসু। টুকি, টুপা, টুসলি ইত্যাদির মত টুসু নামটিও দেশজ শব্দজাত বলেছেন কেউ কেউ (কেন এ নাম হলো সেখানে তা বলা হয়নি)।

তিষ্যা বা পুষ্যা নক্ষত্রের মাস পৌষে টুসু উৎসব তাই টুসু, তুষু বা তিষু এমন চিন্তা মনে আসা অসমীচীন নয়। কিন্তু প্রশ্ন—ব্রতটি পুরোহিত শাসিত নয়। এটি মেয়েলি ব্রত। জ্যোর্তিবিদ্যায় গভীর অনুশীলন না থাকলে এ নামকরণ সম্ভব নয়।

ঊষা বা ওষা থেকে তুষু বা ট্‌সু নামকরণ কষ্ট কল্পনা বলেই মনে হয়।

তুষ টুসু উৎসবে প্রতীক তৈরীর অন্যতম উপাদান মাত্র। তাছাড়া যে দৃষ্টিভঙ্গীতে তুষের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, আলোচনায় এবং সন্তান কামনার সঙ্গে সেই কৃষির যোগ নেই (টুসুতে শস্য কামনার কথা প্রায় নেই)। তাই তুষ থেকে তুষু বা ট্‌সু আসা সম্ভব নয়।

টুকি, টুপা, টুসুলি ইত্যাদির মত টুসু শব্দটি ঠিকই। কিন্তু অকারণে নামকরণ হতে পারে না। কেবল সাদৃশ্যে নামকরণ হয়েছে এ যুক্তি মেনে নিতে মন চায় না।

টুসু মুণ্ডারী ভাষার শব্দ। এখানে ট্‌সু শব্দের অর্থ পুতুল। ৪৯ কিন্তু ট্‌সুর মূর্তি যে অতি সাম্প্রতিক কালের একথা সকলেই প্রায় এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

তাহলে ট্‌সু কোন দেবতা? ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত প্রশ্ন তুলেছেন: তুষু গানে শিবের আবির্ভাব কেন বার বার ঘটেছে? ৫০

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় বলেছেন: মেয়েদের মধ্যে একজনের টুসুর সঙ্গে অপরের টুসুর বিবাহ হয়। উভয়ের টুসুই মেয়ে, কিন্তু তাতে বিবাহ আটকায় না। ৫১ ভাসানের দিন সিনিদেবীর পূজা হয়।

টুসুর সাধ ভক্ষণ, টুসুর বিবাহ কল্পনার সঙ্গে মেয়েদের পরস্পরের টুসুর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পুর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ। সিনিদেবী বৈদিক জগতে হয়েছেন সিনিবালী। ইনি গর্ভধানের দেবী। গর্ভাধান মন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে: গর্ভংদেহি সিনিবালি।

টুসুর মানবী মূর্তির আগে আরও যে একটি প্রতীক পূজিত হতো বা এখনও হয়, যার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুধীর কুমার করণ, সেটি হচ্ছে: কয়েকটি শালকাঠ বা দাঁতনকাটা একটি ঠোঙার মধ্যে রেখে ফুল দিয়ে পুজো করা হয় (অষ্টম পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এটি কি পীঠসহ শিব-প্রতীক নয়? এই দাঁতন কাটার প্রসঙ্গ একটি গানেও আছে:

ই বন কাটি সে বন কাটি
কাটি বনের শাল ঝাটি
শত শত রাজার ছেলে খুঁজেছে দাঁতন কাঠি।
ওলো তুষু খুঁজেছে দাঁত কাঠি।

রাজার ছেলেরা শালঝাঠি কেটে দাঁতন কাঠি খুঁজবে কেন? টুসু উৎসব

যে এককালে শিবপূজার হরগৌরী প্রতীকে হতো তার প্রমাণ উপরিউক্ত প্রসঙ্গ।

কিন্তু আমাদের দেশে শিব বলতে বুঝি ত্রিশূলধারী, বৃষভবাহন, আজানু-লম্বিতবসনপরিহিত একটি মানব মূর্তির দেবতাকে। শিব কখনও শ্বেত কখনও রক্তবর্ণ। শিব নামে তিনি শ্বেতবর্ণ। পঞ্চানন্দ শিব রক্তবর্ণ। এই রক্তবর্ণ দেবতার পরিকল্পনা প্রাচীন মিশর থেকে ক্রীটে, ক্রীট থেকে গ্রীসে গেছে। ৫১ মিশর থেকে এসেছে এদেশে।

বৃষভবাহন, ত্রিশূলধারী যে শিবমূর্তি আমরা দেখতে অভ্যস্ত তার আদিরূপ পাওয়া যায় মিশরে। এই দেবতাটির নাম টেষুব বা টেষুবু। আমাদের দেশে অষ্টবজ্রের (বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়্গ বা দুর্গার অসি) অন্যতম, ত্রিশূলের মতই টেষুবুর ত্রিশূল বজ্রের প্রতীক। পুরুষের জানূর্ধ বসন পরিধান প্রাচীন মিশরীয় রীতি।

এই টেষুবু বা টেষুব আবার কী ভারতে, কী মধ্যপ্রাচ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে অভেদ। ৫৪

টেষুব বা টেষুবু কেবল বৃষভবাহন, ত্রিশূলধারী কতিটাচ্ছদা দেবতাই নন, পিরামিডের একটি লেখায় তাঁকে circumcision-এর দেবতা বলা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, টেষুবু শব্দের অর্থই 'ছুন্নৎ'কারী। ৫৫ আমাদের ধারণা যে, ছুন্নৎ-অনুষ্ঠানটি কেবল পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রাক্‌বিবাহ পর্যায়ে এককালে মেয়েদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য ছিল। এরই পরিবর্তিত সংস্করণ শৈবদের 'গৌরীগরণ' অনুষ্ঠান। ৫৬ এখানে অজাত ঋতু কুমারীদের কৌমার্যভঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'শিবরূপী এক ভৈরব তাদের কৌমার্য হরণ করেন।'

কৌমার্য হরণের দেবতা শিব। তাঁরই প্রতিনিধি ভৈরব। সভ্যতা বিকাশের আদিম স্তরে কোন্ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরণের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তা ব্যাপক অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে এই চর্মচ্ছেদ অনুষ্ঠনের জন্য এক বিশেষ ধরণের লোক নিযুক্ত থাকতো। আমাদের দেশে বিয়ের দিন বর এবং কনের 'কোমরকাম' (কাজ) করতেন নাপিতেরা। ঐদিন স্নানের পর বর বা কনেকে পাটিতে বসিয়ে তাদের মাথার ওপরে চাঁদোয়া ধরতেন এয়োরা। বর বা কনের চারপাশে একটি

লালসুতো সাতপাক দিয়ে রাখা হতো। নাপিত ছেলেদের ক্ষেত্রে দাড়ি কামানো এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নখ কাটার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। অনুষ্ঠানটির যে যুগোপযোগী আধুনিকীকরণ হয়েছে তা পরিষ্কার বুঝা যায় 'কোমর কাম'—এই নাম থেকে। চাঁদোয়া ঢাকা দেওয়া এবং নাম থেকে এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে এটি এক সময় কটিদেশ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ছিল (যার সঙ্গে Cirumcision-এর মিল আছে)। এই ধরণের একটি অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অন্ততঃ একটি টুসুগানে—

আয়রে লাপিত বসরে ঘাটে দেরে টুসুর ঘর কেটে।
এমন দেখে থর কাটবি মান্‌কানালী ছোক রেখে ॥

উল্লিখিত কোমর কাম, টুসু ছড়া এবং এককালের চর্মচ্ছেদন রীতি এই-গুলির মধ্যে সুদূর অতীতে যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয় বলে মনে হয়।

আমাদের আলোচনায় প্রথমে খেপেরা বা খেপরা, পরে টেষুব বা টেষুপ বা টেষেবু দেবতার নাম বলেছি। অন্যদিকে এদের সঙ্গে শিবের নাম যুক্ত করেছি। এদের পরস্পরের যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়। শিবের অপর নাম কপর্দী। খেপরা-ই কি কপর্দী হয়েছে? মূলে মিটান্নিদের দেবতা টেষুবু বজ্রধর বলে কথিত। এমনি আর এক দেবতা সুতেক, হিট্টিদের ব্যাল দেবতার সঙ্গে অভেদ। টেষুবু পশ্চিম হিট্টিদের লৌকিক দেবতা ইন্দ্র ও তর্কুর সঙ্গে অভেদ। আবার টেষুবু উত্তর ইউরোপে থর বা জেয়ুস, উত্তর ভারতে ইন্দ্র, ফ্রিজিয়ায় তর্কু, আর্মোনিয়ায় এবং উত্তর মেসোপোটেমিয়ায়, সুদানে টেষুব বা টেষুপ, সিলিসিয়ায় হারকিউলিস, আসীরীয়া, অমুরুরুতে হাদাদ বা আদাদ, সুপ্রাচীন কালের আক্কাদ এবং সুমেরে রম্মন, ইজিয়ান এবং ক্রীটদের দেবরাজ। ৫৭

বিভিন্ন অঞ্চলের এই দেবকুলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—এঁরা প্রায় সকলেই বজ্রধর দেবতা। আমাদের দেশের লৌকিক শিবও বজ্রধর (লিঙ্গ মূর্তিতে ইনি মস্তকে যে সৃষ্টি বীজ ধারণ করেন তা বজ্র নামে অভিহিত)। সেইদিক থেকে ত্রিশূলধারী, বৃষভবাহন মূর্তির দিক থেকে শিবও টেষুবু অভেদ।

টুসু উৎসবের নামকরণ টেষুব থেকেই হয়েছে (টেষুব—টেসু—টুসু, তুষু, তিষু) এমন চিন্তা করার পেছনে যুক্তিই প্রবল বলে মনে হয়। টেষুব বা টেসুই টুসু হয়েছেন। আজকের টুসুতে নারীপ্রধান রূপ দেখতে পেলেও দাঁতনকাঠি ঠোঙা (যোনিপীঠসহ শিবলিঙ্গ) মূর্তিতে দ্বৈত রূপের প্রকাশ

ঘটেছে (কেউ কেউ তুষ তুষ্লি নামের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দেবতার কল্পনা করেছেন)।

ট্সু গানে বারে বারে 'ছাতা' কথাটি এসেছে। ছাতা এতদঞ্চলের ছাতা পরব বা ইন্দ্রধ্বজার্চনা। আগেই দেখেছি টেষ্বু আর ইন্দ্র অভেদ দেবতা। তাই টেষ্বু গানে ছাতার আবির্ভাব।

আরও একটি দিক আছে। গোবরের নাড়ুর সংখ্যা ১৪৪। আদিম যুগের মানুষ বিমূর্তগণনা জানতো না। তাই কোন বস্তু পরপর সাজিয়ে সংখ্যা ঠিক রাখতো। ইন্দ্রপূজার তিথি দ্বাদশী (সংখ্যাটি ১২)। বার মাসে বারটি শুক্লাদ্বাদশী গুনলে দাঁড়ায় ১২ × ১২ = ১৪৪ (এটি আমার চিন্তার একটি দিক মাত্র। তাছাড়া অনেকেই হয়তো জানেন যে ষোড়শ উপাচারে পূজা করলে কুচোনৈবেদ্য' দিতে হয়। সেখানেও সংখ্যাটি মূলে ছিল ১৪৪। এই দুইটি কি করে মিলে গেল তা ভাববার বিষয়)।

টুসুর ভেলার সঙ্গে ভাদ্রমাসে সপ্রদীপ ভেলা ভাসানোর সাদৃশ্য আছে। বিস্তৃত আলোচনা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ইতিমধ্যেই হয়তো ঘটিয়েছে। তাই এই বলে বর্তমান আলোচনার ইতি টানি যে, টুসু মধ্যপ্রাচ্যের প্রজননের দেবতা টেষ্ব এই শব্দটির অপভ্রংশ। বর্তমানে টুসুতে নারী প্রধান রূপের প্রকাশ ঘটলেও মূলে এটি ছিল পুরুষ দেবতা টেষ্বু বা শিবোপাসনা। এটি কৃষি উৎসব নয়—সন্তান কামনার কুমারী উৎসব।

কি আমাদের দেশে, কি মধ্যপ্রাচ্যে পুরুষ দেবতার নামকে আংশিকভাবে বদলে দিয়ে সেই দেবতার শক্তি (স্ত্রী)র নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইন্দ্র—ইন্দ্রানী, শিব—শিবানী, সূর্য—সূরা, সূরী। মধ্যপ্রাচ্যে বারা—বারা-গুল্লা, ওসিরিস—ইসিস—এগুলি তার উদাহরণ। এই সাক্ষ্যে টেষ্বু, টেষ্ব—টেস্ব-টুসু' তুষ্-তিষ্ এসেছে এই যুক্তিতে ভুল না থাকাই স্বাভাবিক। বর্তমানের টুসুকে অর্থাৎ টুসু উৎসবকে নারী দেবতার পূজা বলে মনে হয় বলেই একথা বলা। আসলে টুসু টেষ্ব নামীয় শিবের সঙ্গে টুসু নাম্নী পূজারিনী বিবাহ কল্পনার উৎসবকে কেন্দ্র করে কুমারী মনের ও আচরণের প্রকাশ (পূজারিনীর সঙ্গে দেবতার মিলন চিন্তা মধ্যপ্রাচ্য, প্রাচীন ইউরোপ এবং ভারতে ছিল)।

তবে আজকের টুসু রাঢ় বাংলা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের আদরিণী কন্যার প্রতীক। এই উৎসবের সজীবতা প্রাণচাঞ্চল্য দুর্গোৎসবের মতই আনন্দমুখর এবং গতিশীল। তাই এর গানে সমাজ জীবনের বহুচিত্র প্রতিফলিত।

গ্রন্থপঞ্জী ও টীকা :

বিহারের টুসু উৎসব

সুহৃদকুমার ভৌমিক

টুসুর দেশ ঃ সীমান্ত বাংলার টুসু ৎসব ঐ অঞ্চলের জাতীয় উৎসব। এই টুসুকে কেন্দ্র করে আমরা একটি সাংস্কৃতিক রেখা টেনে বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী জেলাগুলিকে একই গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে পারি এবং তার নাম দিতে পারি সীমান্ত বাঙলা। এক কথায় ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে প্রাচীন রাঢ় দেশ যাকে বলা হত তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে টুসুর আবাসস্থল। রাজনৈতিক কারণে সেই রাঢ়দেশ দুটি প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আজ। রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুরু করে পুরুলিয়া বাঁকুড়া ছাড়িয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত টুসু তার আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। বর্তমান লেখক এই নিবন্ধে বিহারের টুসু উৎসবের বর্ণনা দেবেন। সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মুক্ত ক্ষেত্রে কর্মের উপরেই বিধৃত করে রাখা হবে এই রচনা। ফলে অনেক কথা প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারণার ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়া বিহারের কানাস, পম্পুঘাট, মুসাবনি, চাণ্ডিলের জয়দা, বুণ্ডু, কাঁচি তামাড়, হুড্রু, জন্হা, রাজারাপাজ্ প্রভৃতি অঞ্চলে আড়ম্বর ও উল্লাসের সঙ্গে টুসুর পরব হয়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গ্রাম ছাড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ বাংলায় টুসু-গানে সমস্ত পরিবেশটাকে মাতাল করে তোলে। এক কথায় বন, পাহাড়, ঝর্ণা, পাহাড়ি-নদীর চড়াই-উৎরাই এই হলো টুসুর দেশ।

টুসুর উৎস ঃ টুসু সম্বন্ধে সাধারণ জনমত এই যে বাংলার প্রাচীন তুষ-তুষলি ব্রতই সীমান্ত বাংলায় টুসুতে রূপান্তরিত হয়েছে।১ তুষ-তুষলি বা তোষ্-তোষ্লা ব্রত নিঃসন্দেহে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎসব। আর টুসু উৎসবও চলতে থাকে সারা পৌষ মাস ধরে—যখন ক্ষেতের শস্য চলে আসে খামারে; ভয় থাকেনা ফসল হারিয়ে যাবার। এক কথায় যে সমস্ত জাতি শিকার জীবনের উপর বেঁচে ছিল এবং বন্য জীবনের মধ্যে পেত বিশেষ আস্বাদন; জন্মসূত্রে টুসু উৎসবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তুষ-তুষলি ব্রত বাঙালির এমন কোনো জনপ্রিয় ব্রত নয়; অনেক ব্রত সংগ্রহে

এই ব্রতের কোনো স্থানই নেই।২ হয়ত মূল উদ্দেশ্য মিশে গেছে লক্ষ্মী ব্রতের সঙ্গে। অথচ সীমান্ত বাঙলায় যে দেশের অধিকাংশ মানুষ অরণ্য-পর্বতবাসী, শিকার জীবনকে পরিত্যাগ করে আসেনি, আদিবাসী-অধ্যুসিত সেই দেশে টুসুর মতো জনপ্রিয় উৎসবই নেই। বাংলা দেশে যেমন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নতুন সাহিত্য, শিল্পভাবনা, আত্মীয়তার আদান-প্রদান, তেমনি সীমান্ত বাংলায় গড়ে উঠে টুসু পরবকে কেন্দ্র করে। কোন্ প্রাণ-শক্তি রাঢ় দেশের রুক্ষ লাল মাটির মধ্যে লুকিয়ে ছিল—যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে গৃহীত তুষ্-তুষ্লি ব্রতের মূল রূপকেও পরাজিত করেছে। নিশ্চয়ই এই রাঢ় বা সীমান্ত বাংলায় তুষ্-তুষ্লি ব্রতকে সহজে গ্রহণ করার মতো উর্বর ক্ষেত্র ছিল, যা অল্প আয়াসে একে করে তুলেছে পত্র-পুষ্পে সজ্জিত বৃহৎ বৃক্ষে।

আবার সীমান্ত বাংলায় টুসু উৎসব এবং সঙ্গীত কেবল মাত্র তাদের মধ্যেই সীমিত যারা বাংলা ভাষী—বাংলা ভাষী সাধারণ বাঙালি ও বাংলা ভাষী আদিবাসী (Bengali speaking tribes)। এও লক্ষ্য করা গেছে যাঁদের মাতৃ ভাষা সাঁওতাল বা অ-বাংলা তাঁরা ওতঃপ্রোতভাবে টুসু পরবের সঙ্গে যুক্ত নন। রাঁচি, জন্হা, বুণ্ডু প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত সীমার মধ্যে বিশুদ্ধ হিন্দীভাষী নেই। এই অঞ্চলে (সীমান্ত বাংলা) খুব কম হলেও তিন চারটি উপভাষা রয়েছে। নাগপুরিয়া, সাদ্রি, বহড়াগড়িয়া, পাঁচপরগনিয়া—যার মধ্যে আছে বুণ্ডু, তামাড়, রাহে, সোনা-হাতু, সিলি অঞ্চলের গালুয়ারি ভাষা ইত্যাদি, বলতে গেলে এগুলি বাংলা উপভাষার মতো। স্থানীয় লোকেরা এই সব ভাষায় কথা বললেও সঙ্গীতের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে শুদ্ধ বাংলাতেই করেন।৩ ফলে বুণ্ডু থেকে জন্হা-রাঁচি পেরিয়ে একেবারে রাজারাপাজের টুসু পরবে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার টুসু গান নেই। এক কথায় কোল গোষ্ঠীর (Austro-Asiatic) সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো ছাড়া প্রায় সকলেই এই সব উপভাষার যে কোনো একটিতে কথা বলেন। এই সূত্রে খেড়িয়া, শবর, লোহার, লোধা, ভূমিজ প্রভৃতি বাংলা ভাষী আদিবাসী তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে টুসু উৎসব ও সঙ্গীতকে একাকার করে নিয়েছেন। অরণ্য, পাহাড়, জলপ্রপাত-ঝর্ণায়পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত রাঢ় বাংলায় টুসুর মতো উৎসবের জন-প্রিয়তা দেখে একে কোল বা Austro-Asiatic জাতির থেকে আগত উৎসব

বলে যেন মনে না করি। "হড়্কোরেণ মারে হাপ্ড়ামকো রেয়াঃক্ কাথা"৪ এবং "খেরোয়াল বংশাঃক্ ধরম্ পুথি" পুস্তকে৫ সাঁওতাল জাতির মধ্যে টুসু পরবের উল্লেখ নেই। বর্তমান লেখকও লক্ষ্য করেছেন—সাঁওতালদের সঙ্গে টুসু পরবের কোনো সম্পর্ক নেই—তবে মেলা বা উৎসবে তাঁরা যোগ দেন—এমন কি সাঁওতালী টুসু গান গেয়ে নাচেনও।৬ মুণ্ডাদের প্রাচীন ঐতিহ্যেও টুসু পরবের উল্লেখ নেই।৭ কাজেই ধরে নিতে পারি টুসু ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজ থেকেই সীমান্ত বাংলায় প্রবেশ করেছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বহু আদিবাসী আকর্ষণ করেছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে তাঁদের মধ্যে ঐ সময় যে সমস্ত উৎসব ও সংস্কার ছিল তার বহু উপাদান এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই হয়ত তুষ্-তুষ্লি ব্রত থেকে টুসু হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট।

টুসু সম্বন্ধে লোক-ধারণা ঃ সীমান্ত বাংলায় টুসু বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় ধারণাগুলির এখানে একটি তুলে ধরছি। বাঁকুড়ায় টুসুমেলা বসে কংসাবতীর তীরে পুরকুলে। এতবড় টুসুমেলা বোধহয় এ অঞ্চলে আর কোথাও হয়না। সেখানে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, অল্প বা বেশি নানা বয়সের মানুষের কাছে টুসু বিষয়ক নানা খবর পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লোহার নামে এক টুসু দলের সর্দার বলেছিল, টুসু পরবের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশুদ্ধ আনন্দ ছাড়া টুসু উৎসবের কোনো লক্ষ্যই নেই। "আমাদের কেউ কেউ টুসুকে দেবী হিসাবে মনে করেন, কেউ কেউ তা মনে করেননা। যে যেমনভাবে টুসুকে মনে করে তেমনি। ধর্মীয় দেবদেবীর প্রতি বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার যে ধারণা রাখা হয় টুসুর প্রতি তেমনি নয়। তাই দেখুন না তাকিয়ে, কত রকমের টুসু আমরা এখানে এনেছি। হেলিকাপ্তারে টুসু, মোটর সাইকেলে টুসু, আরো কত রকমের কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কিংবা দুর্গা বা মনসার মূর্তি নিয়ে কি এমনি পুতুল খেলা চলত ?" সেই রকম শ্রদ্ধার মনোভাব টুসুর ওপর এখনও দানা বাঁধেনি।

আমার মনে হয়, সারা পৌষ মাস ধরে সীমান্ত বাংলার ঘরে ঘরে চলত নবান্ন জাতীয় উৎসব এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আর কিশোর কিশোরীদের মধ্যে চলত পুতুল খেলা। নিজের পুতুলের সঙ্গে আর এক পুতুলের সম্পর্ক বিনিময় করে গড়ে উঠত আত্মীয়তা। এ যে কত

উদ্দীপনাপূর্ণ আর রোমান্টিক কোনো কোনো পাঠক তাঁদের শৈশব স্মৃতি স্মরণ করে অনুমান করতে পারেন। মনে হয়, এমনি একটি প্রিয় আনান্দানুষ্ঠান যা নাবালিকা কিশোরীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে নেওয়া তুষ্-তুষ্লি ব্রত এসে একাকার হয়ে আধা-ধর্ম আধা-লোকাচারের অবস্থায় এসে টুসু থমকে গেছে। পুতুল খেলা কিশোর-কিশোরীদের অন্তরের খেলা। ছেলেভুলানো ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশেষ মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তান রূপে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে।" তারপর সেই সন্তানতুল্য বস্তুটিকে নিয়ে নানা সমস্যা, নানা স্বপ্ন, কন্যা হিসাবে তার বিবাহ, পুত্র হিসাবে তার কৃষিক্ষেত্রের কাজে কষ্টের কথা ভেবে নানা রকম গান আর ছড়া।৮ সারা বছরের পুতুল খেলার সম্পর্কের বিনিময়গুলো দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সীমান্ত বাংলার কিশোরীরা পৌষমাসের জন্য তুলে রাখে—যখন মাঠের ফসল আসবে ঘরে। "এ হল আমাদের আনন্দোৎসবের মেলা, আনন্দ আর ফূর্তি—সারা মাস ভোর ধরে চলছে এমনি।"৯ একান্তভাবে লোকউৎসব টুসু কোনো ধর্মের অনুশাসনে বদ্ধ নয়, কোনো আচারের সীমায় সীমিত নয়: 'টুসু' জনমানসের আনন্দের অনাবিল অভিব্যক্তি। উৎসবের প্রতীক 'টুসু' অর্থাৎ একটি পুতুল। এই টুসুকে কেন্দ্র করে আনন্দের উচ্ছলতা, বেদনার অভিযোগ অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জনজীবনের মানসিকতার সর্বাঙ্গীন প্রকাশ।"১০ টুসু আজ দেবী হিসাবে গৃহীত হলে টুসু যে কিশোরীদের খেলার পুতুল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই হয়ত তুষ তুষলি ব্রতের তুষ শব্দটি এতে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে কোল (Austro-Asiatic) গোষ্ঠীর টুসা (টুসাউ) শব্দটির সঙ্গে এর সামান্য সম্পর্ক থাকতে পারে। কোল ভাষায় এ শব্দের অর্থ হল ফুলের গুচ্ছ, ফুলের মাহেরি—তারুণ্যের প্রতীক। 'বাহা-টুসাউ' ফুলের তোড়া। Macphail ও তাঁর অভিধানে টুসাউ শব্দ চয়ন করে গেছেন। বাঙলা টস্ টসে প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে। বিহারের রাঁচি হাজারিবাগ ও সিংভূমের উত্তরাংশে দেখেছি টুসু বিসর্জনের দিন টুসুর কোনো মূর্তি নেই—ফুলঘর, পাতা সমেত গাছের ডালে সজ্জিত ফুলের গুচ্ছ—ফুলঘর বা দলই ভাসানের

জন্য নদীতে নিয়ে যায়। সাঁওতালীতে যাকে বলে 'বাহা টুসু'। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে টুসু পরবের দিন জোন্হা জলপ্রপাতে বিসর্জনের জন্য একটিও টুসু মূর্তি নিয়ে আসতে দেখিনি। ঠিক এমনিভাবে দেখা যায়নি রাজ্রা-রপাতেও। শুধু ছিল কাগজের তৈরী ফুলে সজ্জিত হাজার হাজার চৌদল। জানিনা কোন ভাষাগোষ্ঠীর টুসো শব্দ টুসু সৃষ্টির পশ্চাতে কাজ করেছে কিনা। তবে বিহারের বহু স্থানে 'টুসু' অর্থাৎ পুতুল যে টুসু বিষয়ক পুতুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন বিহারের কানাস ঘাটে টুসু পরবের প্রস্তুতি বিষয়ক একটি ছাপানো বিজ্ঞাপন থেকে এটি বোঝা যাবে। কানাস ঘাটে গেলে এই বিজ্ঞাপনটি হাতে এসেছিল।

মেলা! টুসু মেলা!! আনন্দ মেলা!!!

॥ টুসুর প্রতিযোগিতামূলক মেলা ॥

স্থান—সুবর্ণরেখা নদীর কানাস ঘাট।

তাং বাংলা ১লা মাঘ।

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ

মলভূমের মুখ্য পর্ব 'মকর'। মকর পর্ব মলভূমের জনতার মনে প্রাণে এনে দেয় এক নূতন জোয়ার, সে জোয়ারের ফল স্বরূপ আপন প্রকৃতিস্থ রূপকে সম্পূর্ণরূপে জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিতে থাকেন। টুসু সঙ্গীতে রসিকবৃন্দের উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন। এখানে নির্বাচন অনুসারে টুসুগুলিকে পুরস্কৃত করা হবে। এই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা দলে দলে এই মেলায় যোগদান করুন।

প্রেসিডেন্ট্—শ্রীরামেশ্বর ধীবর, সেক্রেটারী—শ্রীচিকুর মাঝি। ১ম পুরস্কার—৩১ টাকা, ২য় পুরস্কার ২১ টাকা, ৩য় পুরস্কার ১১ টাকা সান্ত্বনা পুরস্কার ৫ × ৫ টাকা।

নির্বাচক মণ্ডলী: শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীমদন ধর, শ্রীদশরথ সরেণ, শ্রীহাবল ধীবর, শ্রীপরমেশ্বর পাল, শ্রীহুতাশন মণ্ডল, শ্রীগুরুচরণ ভকত।

এখানে সাধারণ লোকের কথায় 'টুসু' প্রতিমা না বলে শুধু টুসু বলা হয়েছে। যেমন 'টুসুগুলিকে পুরস্কৃত করা হবে।'

লোক-ধারণায় টুসুর কথা বলতে গিয়ে আর একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ না করে থাকা গেল না। সোনারীঃ জামসেদপুরের বিখ্যাত ঝুমুর লেখক বিপিনবিহারী মুখী তাঁর ঝুমুর সঙ্গীত পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"প্রতি বছর পেরিয়ে আবার ফিরে আসে পৌষ মাস। লক্ষ্মীমাস টুসু মায়ের আবির্ভাব হতে চলেছে। আকাশে তাই ঝঙ্কৃত হচ্ছে—মায়ের আগমনীর শুভ শঙ্খধ্বনি। বাতাসে আর ছোটনাগপুরের শাল পিয়ালের বনে হিন্দোলিত হচ্ছে "টুসু ও ঝুমুর মায়ের" গানের অপূর্ব সুর লহরী।"১০ পাঠক লক্ষ্য করবেন কিভাবে 'টুসু'মায়ের সঙ্গে 'ঝুমুর' মায়ের আগমন ঘটেছে। সীমান্ত বাঙলার সাধারণ মানুষের মনের কোণায় এমনিভাবে সযত্নে গড়ে উঠেছে একটি স্থান 'ঝুমুর মায়ের' জন্য। আমরা সকলেই জানি ঝুমুর একটি বিশেষ ধরণের সুর—সঙ্গীতের একটি প্রবীন বিষয় হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেম। আর তাতে আছে যথেষ্ট পরিমাণ লৌকিক স্পর্শ। আমার মনে হয় অতীতের লোকউৎসব 'টুসু' ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণে আজ টুসুমায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিহারের পম্পুঘাট নামক স্থানে টুসু মূর্তির কল্পনায় বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। সেখানের টুসুগুলিকে পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হলো ঃ টুসু লক্ষ্মীরই ভিন্ন রূপ। অপরটি হল ঃ টুসু গঙ্গার আর এক রূপ। এই দুটি চিত্রকে স্পষ্ট করে নিয়ে বিভিন্ন শিল্পী বিচিত্র প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। "বাংলার লৌকিক দেবতার" লেখক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় বলেছেন, "টুসু দেবীকে দণ্ডায়মান দেখা যায়, এর মূর্তি বড় হয়না—উচ্চতায় এক ফুট পর্যন্ত দেখা যায়।"১১ কিন্তু আমি ৬ ফুট পর্যন্ত প্রায় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে পাল্লা দেবে এমন প্রতিমাও দেখেছি। এই সমস্ত মূর্তির আলোকচিত্রও সংগৃহীত আছে। টুসু প্রতিমার বিপুল আয়োজন দুটি জায়গায় বেশি দেখা যায়, সুবর্ণরেখার পম্পুঘাট ও কংসাবতীর পুরকুলে। আমরা অনুমান করতে পারি বিশেষ ধরণের রাগিনী 'ঝুমুর' একদিন 'ঝুমুর মায়ে' রূপান্তরিত হয়ে টুসুর সঙ্গে পূজিতা হবেন এবং পরে স্থির হয়ে যাবে টুসু হলেন লক্ষ্মী এবং পরে ঝুমুর হবেন সরস্বতী। এ সমস্ত হিসাব আমরা করছি সীমান্ত বাংলার লোক-ধারণার দিকে তাকিয়ে। টুসুর প্রত্যক্ষ প্রভাব সাঁওতালদের উপরও

পড়েছে। সাঁকরাৎ, স্নান ও পিঠে খাওয়া, বেঝা বিঁধা বা লক্ষ্যভেদ উৎসব প্রভৃতি এই সময়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। শুধু তাই নয় সুবর্ণরেখার পম্পুঘাটে সাঁওতাল রমণীরা সহরায় চং-এ টুসু মেলায় নাচের আসরে যোগ দিয়েছেন, পুরুষরা তাতে বাদ্য সঙ্গীতে যুক্ত হয়েছেন। সাঁওতাল ভাষায় নিখুঁত টুসু সুরে তারা চমৎকার গানও গেয়েছেন। এই প্রবন্ধের শেষে সংকলিকা অংশে তার কিছু নমুনা রেখেছি।

টুসু ও ঝুমুর ঃ টুসুর কথা বলতে গেলেই 'ঝুমুর' এসে যায়। কারণ অনেক সময় টুসু গান আর ঝুমুর গান একাকার হয়ে গেছে। দুয়েরই প্রধান উপাদান সঙ্গীতএবং আন্দোৎসবের বহিঃপ্রকাশ। শুধু টুসু একটি বিশেষ সময়ে উদ্‌যাপিত হয় আর ঝুমুর সাধারণ সঙ্গীতের মতই বিভিন্ন সময়ে চলতে থাকে। তবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যানুসারে কখনও বেশি কখনও কম। ঝুমুর শব্দটি পায়ে নূপুর বেঁধে নাচবার সময় ঝুম্ ঝুম শব্দ থেকেই এসেছে। একটি হো পাড়ায় গান সংগ্রহের সময় হঠাৎ তারা বাংলাতে গান শুরু করলে। তারা বলেছিল ঃ "ঝমর"। ঝুমুর বলা সত্ত্বেও তারা বলেছিল ঃ "ঝমর"। ঝুমুর সম্বন্ধে 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' পুস্তকে ডঃ সুধীর করণ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ষোড়শ শতকের পূর্বেও লৌকিক রাগিনী হিসাবে ঝুমুরের নাম পাই। শব্দকল্পদ্রুমে 'ঝুমুরি (স্ত্রী) রাগিনী বিশেষ' বলে (সঙ্গীত দামোদরের শ্লোকে) উল্লেখ করেছেন—

প্রায় শৃঙ্গার বহুলা মাধবীকে মধুরা মৃদুঃ
একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদি নিয়োম জঝিতা।
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহরি বিশেষকম্
ইদং হি শালগং সূত্রং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জেনম্॥

দেখা যাচ্ছে ঝুমুরের চরিত্র এবং লক্ষ্যের মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীনকালের কোনো পার্থক্য নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সীমান্ত বাংলার জমিদার বাড়িগুলি ছিল ঝুমুরের প্রধান ক্ষেত্র। বর্তমান ঝুমুর বলতে সাধারণতঃ সীমান্ত বাংলার গানকেই বুঝি। নাচনীরা ঝুমুর গান গায়। কোথাও কোথাও ঝুমুরের দল গড়ে ওঠে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যাঁরা টুসু গান রচনা করেছেন তাদের কেউ কেউ ঝুমুর গানও রচনা করেছেন। এক সময় কলকাতায় ঝুমুর দলের উৎপাত ছিল। "কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা" পুস্তকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—"কলিকাতায় তখন-

কার দিনে ঝুমুরওয়ালী ছিল। তাহারা ছোটলোক, কেলে কেলেমাগী, কাছ দিয়ে চলে গেলে একটা দুর্গন্ধ ছাড়ত; তাহারা পায়ে ঝুমুর দিয়া গাহিত। তখনকার দিনে বিবাহতে গরুর গাড়িতে কাগজের ময়ুরপঙ্ক্ষী করে তার উপর ঝুমুরওয়ালীর নাচ দিত। ঝুমুরওয়ালীরা সেই ময়ুরপঙ্ক্ষীর উপর নাচিত আর পিছনে একটা লোক ঢোল কাঁসি বাজাইত।"১২

ঝুমুর ও ঝুমুরওয়ালী সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলার কারণ আছে। ঝুমুর এক সময় নাচ ছিল, তারপর তার উপযুক্ত গান; এখন যে কোনো গান। কোথাও কোথাও লোক-ধারণায় ঝুমুর দেবী বা ঝুমুর-মায়ে রূপান্তরিত হয়ে টুসুর কাছাকাছি এসে গিয়েছে। হয়ত টুসুর বাল্য ইতিহাসও এই রকম। আবার অনেক সময় দেখা গেছে টুসু গান সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ঝুমুরে স্থান লাভ করেছে। তাহলেও ঝুমুরের সঙ্গে টুসুর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে—যদিও দুটির উৎস বিশুদ্ধ আনন্দ। টুসু ধীরে ধীরে দেবীপুজার পরিমণ্ডলের দ্বারা আবৃত হতে চলেছে। আর ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী বিশেষ স্থান নিতে চলেছে। ঝুমুরে রয়েছে বিচিত্র সুরের সমাবেশ। অপর পক্ষে গানের সুর শুনলেই বোঝা যায় টুসু সুর কিনা। এখানে টুসু সুর সম্বন্ধে সামান্য বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

টুসু সুর ঃ রাঁচি, পুরুলিয়া-মেদিনীপুর এই তিনটি কেন্দ্রকে মোটামুটি সরল রেখা দিয়ে যোগ করলে যে ত্রিভুজ ক্ষেত্র পাওয়া যায় তাই হলো টুসুর আড়ং এবং এই অঞ্চলে টুসু গানের তিনটি সুর দেখা যায়। আধুনিককালে লোক-গীতি গাইতে গিয়ে যে দু-একজন শিল্পী টুসু গান গেয়ে থাকেন সেটি একটি বিশেষ সুর। সম্ভবতঃ তার আবির্ভাব পুরুলিয়া অঞ্চলে। কোনো কোনো জায়গার লোক একে বলে সতী সুর। শব্দটি মনে করিয়ে দেয় পুরুলিয়ার বিখ্যাত সতীঘাটের টুসু পরবকে। এই সুর ভাসানের দিন প্রায় একই আকারে শুধু পুরুলিয়া নয়, হাজারিবাগ (রাজা রাপাজ) রাঁচি—সনহা, বুণ্ডু সিংভূমের বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায়। আর একটি অদ্ভুত টানা সুর আছে। এমন লালিত্য যুক্ত টানা সুর তার মূর্ছনা খুব কম লোকসঙ্গীতে শোনা যায়। ঝাড়গ্রামের লোধাগুলি থেকে নারায়ণগড় পর্যন্ত—এই অঞ্চলের মধ্যে টুসুসুর হিসাবে এর প্রাধান্য। বছর কয়েক আগে স্বর্গত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সভংগীর

ব্যবস্থাপনায় বেতারে জেলা-ভিত্তিক অনুষ্ঠানে (মেদিনীপুর অনুষ্ঠান) ঐ সুরে টুসুগান বাজানো হয়েছিল। আর একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় টুসু সুর আছে যা সাধারণতঃ ভাসানের মেলায় গাওয়া হয়। এবং সেই সুর রাঁচী-জন্‌হা থেকে শুরু করে পম্পুঘাট, কানাস, ধলভূম হয়ে বাঁকুড়ার পুরকুল ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। আমার মনে হয় টুসুর এই তিনটি সুরই এক সময় সর্বত্র প্রচলিত ছিল—থাপন পালনও ভাসানের জন্য। ভাসান সুরটি গাওয়া হত টুসু বিসর্জনের সময়, এবং বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয়। পালন সুর টানা সুরে একমাস ধরে টুসুকে নিয়ে নানা গল্প-কল্পনা করে গাওয়া। এই সুরটি মেদিনীপুরের বিশেষ একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। থাপন সুর টুসুকে যেদিন বোধন করল সেই সময়ের জন্য। অবশ্য এসব বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে আরো বেশি পরিমাণ মাঠ-ময়দানে সংবাদ সংগ্রহ করা দরকার।

টুসু-পুরাণঃ মোটামুটি টুসু দেবীর মর্যাদা পেলেও তাঁকে নিয়ে কোনো পুরাণ গড়ে উঠেনি। মেয়েরা সুর করে গাইবে এমন ব্রত কথাও না। যেখানে ইতু পূজোর পাঁচালি বা সন্তোষী মার ব্রতকথা গড়ে উঠেছে। তবে লোকমুখে টুসুকে নিয়ে প্রায় সর্বত্রই একটি জনপ্রিয় গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এই গল্পটি সামান্য পরিবর্তিতভাবে আমিও দু-তিন জায়গায় পেয়েছি। দীর্ঘকাল আগে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুধীর করণ যেভাবে সংগ্রহ করেছেন তাই এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো।১৩

"কুর্মী সমাজে এক রূপবতী কন্যার ডাক নাম ছিল টুসু, ভালো নাম রুক্মিনী। কন্যাটি রূপেগুণে লক্ষ্মীর মতো। এক কুর্মী যুবকের সঙ্গে তার বিবাহের কথা নির্ধারিত ছিল। রুক্মিনী আর সেই কুর্মী যুবক পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসত আগে থেকেই। এদের বিবাহ উৎসবের তিথি যত ঘনিয়ে আসে, তত খুশি হয় সমগ্র কুর্মী সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই। কিন্তু বিবাহ তিথিতে বিবাহ কার্য শেষ হবার পূর্বেই মুসলমানরা এসে অন্যান্য ধনসম্পত্তির সঙ্গে লুট করে নিয়ে যায় তাদের। মুসলমানদের অভক্ষ্য শূকর মাংসে এদের প্রীতি আছে শুনে শেষ পর্যন্ত তারা এদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জন করে। রুক্মিনী এবং সেই কুর্মী যুবক যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন কুর্মী যুবকের অভিভাবকরা রুক্মিনীর সঙ্গে তার বিবাহে বাধা দেয়। যে মেয়েকে মুসলমান ছুঁয়েছে, সে

মেয়ের সঙ্গে কারুরই বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু এর ফলে তাদের পারস্পরিক প্রেম মোটেই ব্যাহত হয়নি। কুর্মী যুবকটি অভিভাবকদের মত পরিবর্তন করতে না পেরে মনের দুঃখে বনে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। এদিকে রুকৃমিনী অনাহারে অনিদ্রায় দিনাতিপাত করতে থাকে। আর কি করে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবে এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। একদিন সবাই শুনল টুসুমনি ঘর থেকে নিরুদ্দেশ। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রুকৃমিনীর ডাক নামটাই বেশি প্রচলিত ছিল দেশে। ফলে ঘরে ঘরে টুসুর আলোচনা। ভালোবাসার ধনকে ফিরে পাবার জন্য টুসুর গৃহত্যাগের কাহিনী কুমারী মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। টুসু তাদের আদর্শ হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন সবাই শুনল টুসু তার বরকে ফিরে পেয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। টুসুর একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। চতুর্দিক থেকে সবাই ছুটে চলল টুসুকে দেখতে— ইচাগড় থানার সতীঘাটায়। সুবর্ণরেখার একটি ঘাটে তারা দেখতে পেল টুসুকে আর সেই সন্ন্যাসী বরকে। লোকের আনন্দের অবধি রইল না। কিন্তু এত আনন্দ সইল না। অনাহারে অনিদ্রায় টুসুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল। বাঞ্ছিতকে পাবার পরেই তার মৃত্যু ঘটে সেইখানে।

বাঞ্ছিতের জন্য টুসুর এই আত্ম বিসর্জনকে কুর্মী বা মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলেছে আজও। ইচাগড থানায় (বর্তমান সিংভূম জেলার অন্তর্গত) সতীঘাটায় আজও টুসু উৎসব উপলক্ষে বিরাট জন সমাবেশ হয়।"

এই কাহিনীর আর এক রূপ এই রকম—"কুর্মী কন্যা টুসু খেলার ছলে এক সন্ন্যাসীর লাঠি রাখলে নদীতে লুকিয়ে। সাধু গেলেন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে এবং রাজাকে বললেন লাঠি মুহূর্তের মধ্যে এনে না দিলে তিনি নদীকে দেবেন শুকিয়ে। ভয়ে টুসু দোষ স্বীকার করল এবং সন্ন্যাসীর লাঠি আনতে গিয়ে নদীর জলে কোথায় হারিয়ে গেল। পুরকুলের ঘাটে মাঝ নদীতে এক মস্ত পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে—অনেকের ধারণা সেখানে ঘটেছে টুসুর সমাধি। এই কাহিনীর নানা পরিবর্তিত রূপ নানা স্থানে পাওয়া যায়।

কাহিনীর যে রকম পরিবর্তনই হোক না কেন কয়েকটি সাদৃশ্য লক্ষ্য

করা যায়। (১) কুর্মী বা মাহাতোদের সঙ্গে টুসুর একটি সম্পর্ক আছে ; (২) আর টুসুর সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর যোগাযোগ ঘটেছিল।

মাহাতো সম্প্রদায় ও টুসু ঃ কুর্মী মাহাতোদের সঙ্গে টুসুর জন্ম-রহস্য জড়িত বলেই এই অধ্যায়ের অবতারণা। সাধারণ মানুষের মধ্যে মাহাতোদের সম্পর্কে যথেষ্ট ভুল ধারণা আছে। মাহাতোদের বাসভূমি রাঢ় অঞ্চল—অর্থাৎ সীমান্ত বাংলার জেলাগুলি নিয়ে রাঁচী, ধানবাদ, সিংভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর। ওইসব অঞ্চলে কোল-গোষ্ঠীর মানুষের (Austro-Asiatic) প্রাধান্যই বেশি। ফলে সীমান্ত বাংলার বাইরের মানুষ মাহাতোদের কোল-গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে মাহাতোরা জন্ম সূত্রে ভিন্ন গোষ্ঠীর (Austro-Asiatic) বা কোল গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ভাষা বিচারেও মাহাতোদের সঙ্গে কোল-গোষ্ঠীর মানুষের সামান্য সম্পর্কও নেই। এতকাল ধরে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও মাহাতোদের ভাষা বিশুদ্ধ নব-আর্যভারতীয় অর্থাৎ বাংলা। বঙ্গভূমি থেকে বহুদূরে রাঁচি, হুণ্ড্রু, কিংবা জন্‌হা পাহাড়ি গ্রামে যে মাহাতোরা বাস করেন তাঁরাও ঘরে বলেন কুরমালি বা ভাঙা বাংলা এবং টুসু পরবের সময় গান করে যান বিশুদ্ধ বাংলায়। এই সব অঞ্চলে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাষা থাকলেও মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনা প্রকাশের জন্য সাহিত্যের ভাষা হিসাবে বাংলাকেই গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার যে এত বিস্তৃতি তার জন্য বাঙালিদের ঋণ স্বীকার করতে হবে মাহাতোদের কাছে। আমার মনে হয় মাহাতোরা আর্যভাষী (Aryan-speaking) কোনো সম্প্রদায়ের বংশধর ; স্মরণাতীতকালে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। বাংলাদেশে এইভাবে দূরতম দেশের মানুষ নানা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করে। যেমন সুসভ্য তামিল জাতির কোনো সম্প্রদায় নিছক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসে-ছিল বহুযুগের ওপার থেকে। তারা বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে আজ একাকার হয়ে গেলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কাঠামোয় তারা তাদের মত তৈরী করে নিয়েছিল একজাত—তাম্বুলি বা তাম্‌লি। মধ্যযুগে বিশেষতঃ মুসলমান আক্রমণের পর পশ্চিম ভারতের বহু জাতি পূর্ব ভারতে চলে আসে। এদের মধ্যে শোলঙ্কারা উল্লেখযোগ্য। শোলঙ্কীদের ভাষা, পদবী, আচার ব্যবহার—স্থানীয় বাঙালিদের মতোই—কিন্তু জাতে তারা শোলঙ্কী।

মহামাত্র নামধারী ক্ষত্রিয়রা স্মরণাতীত কালেপূর্বে এদেশে প্রবেশ করেছিল। বিস্তৃত বাংলাভাষীর তাম্বুলি বা তাঁমলি কিংবা শোলঙ্কীদের মতোই মাহাতো (মহামাত্রের বংশধর) একটি জাত। এই মাহাতোর নানা শাখা যেমন কুর্মী (শ্রমিক), কয়েরি (শব্জি উৎপাদক কৃষক) গোয়ালা, বাগাল, তিলি, কুমোর ইত্যাদি।

মাহাতো শব্দের উৎস হলো মহামাত্র। মহামাত্র শব্দ মহাআত্ত, মহাত্ত ও পরে মহাতো বা মাহাতোতে পরিণত হয়েছে। মাহামাত্র শব্দের দুটি অর্থ—ক্ষত্রিয় সৈন্য এবং মন্ত্রণাদাতা বা মন্ত্রী।' অমরকোষের ক্ষত্রিয় বর্গে আছে "মহামাত্রাঃ প্রধানানি।" আর টীকায় বলা হয়েছে প্রধান অমাত্যের নাম মহামাত্র। অমরকোষের খুব একটি পুরাতন সংস্করণে বলা হয়েছে, "মহতীমাত্রা পরিচ্ছদ এষাং—মাত্রা কর্ণ বিভূষায়াং বিত্তেমান পরিচ্ছদে"। এ ছাড়া আরো বলা হয়েছে, "প্রকৃতৌ চ মহামাত্রে প্রভায়াং পরমাত্মনি।" অবশ্য শেষ কথাটি বলা হয়েছে প্রধান অমাত্যের প্রজ্ঞার কথা ভেবে। এছাড়া মহামাত্রের আর একটি অর্থ অমরকোষ দিয়েছেন—"মহামাত্র প্রবীনে স্যাত্তথা হস্তিগকাধিপ"। অমরকোষের টীকাকার এটি পরবর্তী শব্দকোষ থেকে গ্রহণ করেছেন।১৪ আর শব্দ-কল্পদ্রুমঃ ভরতের টীকা উল্লেখ করে বলেছেন, "সেনাপত্যাদিষু মহতীমাত্রা ধনং পরিচ্ছদ বা যেষাং তে তথা"—সেনাপতিগণের মধ্যে যাঁরা ধন ও পরিচ্ছদে উন্নত (বেতন ও ইউনিফর্ম)। অর্থাৎ সেনাপতিগণের উচ্চতর কর্মচারী বা যোদ্ধা। শব্দকল্পদ্রুমঃ মহামাত্রের অপর অর্থ ঃ হস্তিপকাধিপঃ' (—ইতি মেদিনীকোষ) কেও স্বীকার অর্থাৎ যুদ্ধে হস্তী-বাহিনীর চালক, এক কথায় হস্তী-যোদ্ধা। যাঁরা দাবা খেলেন (১২ চতুরঙ্গ) তাঁরাই জানেন রাজা ও মন্ত্রীর পরেই গজের ক্ষমতা বা স্থান। চর্যাপদে (সংখ্যক পদ) আছে একা গজই পাঁচ জনকে ঘায়েল করলে পর মন্ত্রী রাজাকে কিস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল। শুধু মধ্য যুগে নয় প্রাচীন যুগেও হস্তী-যোদ্ধার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। যাই হোক 'মহামাত্র' শব্দ থেকে যেমন মাহাতো শব্দের জন্ম হয়েছে তেমনি মাহুত শব্দেরও জন্ম হয়েছে। 'চলন্তিকা' নির্দেশ করেছেন মাহুত শব্দও মহামাত্র থেকে এসেছে। তাঁরা বিশাল জন্তু হস্তীকে বশ করে তাঁর ওপর থেকেই যুদ্ধ করতেন। মহামাত্র সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কোনো প্রাচীন আর্যভাষী ক্ষত্রিয়ের বংশধর। কিন্তু

বিভিন্ন কারণে তাঁরা শোলঙ্কী বা তাম্বুলীদের মতো তাঁদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং নতুন করে সমাজ তৈরী করে নিয়েছেন রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে। দারিদ্র্য এবং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির কশাঘাতে মাহাতো সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এদেশে জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছিল কৃষি-কর্মকে বা কিষাণের কাজকে। ফলে ছোটনাগপুরের রাঢ়ভূমিতে যে কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠল তার পেছনে রয়েছে এই সম্প্রদায়েরই অবদান। এক সময়ে এদের একটি সম্প্রদায় কর্মী হিসাবে সুখ্যাতি পেয়েছিল—যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল কর্মী সম্প্রদায়। তারপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছকে গোত্রের সন্ধানে স্বভাবিকভাবে তৈরী হলো কুর্মী ক্ষত্রিয়। এই কুর্মীদের শুদ্ধ ভাষাই হলো টুসু গানের প্রধান বাহন। কুর্মীদের ভাষার নাম কুর্মালি ভাষা।১৫

টুসু নিযে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী অনুসারে কুর্মী ক্ষত্রিয় বা মাহাতোদের সঙ্গে টুসুব উৎস নিহিত আছে বলেই আমি এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে এত কথা বললাম। এবং আরো দু-একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনার পর দেখব মূল রহস্য কোথায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব পুস্তক' শুরু করেছেন 'হস্তি চিকিৎসা' অধ্যায় দিয়ে। তিনি বলেছেন, "বেদের আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না। কারণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায়না।" তাই ঋগ্বেদে মাত্র দুবার হাতীর কথা আছে, তাতে বলা হয়েছে, "হাতওয়ালা মৃগ বা শুড়ওয়ালা পশু। হস্তী বা হাতী নাম এইভাবে হয়েছে।" হাতীর আসল বাসস্থান বাংলা, পূর্ব-উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্যন্ত হাতী দেখা যায়।...এই যে হাতী ধরা ও পোষ মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈরী করা —এসব কোথায় হয়েছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। "আমরা এখন যে দেশে বাস করি। যাহা আমাদের মাতৃ-ভূমি, সেই বঙ্গ দেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের একদিকে হিমালয়, একদিকে লৌহিত্য, ও একদিকে সাগর সেই দেশেই হস্তি বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন,

হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমনকি এক রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেখানে যাইতেন ; কোনোদিন পাহাড়ের চুড়ায়, কোনোদিন নদীর চড়ায়, কোনো-দিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার জোগাইয়া দিত। ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।" সেই সময় অঙ্গ দেশের রাজা লোম-পাদের হাতী চড়ার শখ হলো। লোক লাগিয়ে ঐ মুনির অনুপস্থিতিতে তাঁর অনেক হাতী ধরে নিয়ে এল। এদিকে, ঋষি আসিয়া দেখিলেন তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারদিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেকদিন খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে। তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে। নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতাপাতা শিকড় মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানা রূপ তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ।" বহু অনুরোধের পর তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন এই রূপ—

> "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ—সাগরাভিমুখে যাই-তেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরষে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পাল। আর কাপ্য গোত্রে আমার জন্ম। সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পাল-কাপ্য বলে। আমি হস্তি চিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।"

তারপর তিনি তাঁর রচিত হস্ত্যায়ুর্বেদ বা পালকাপ্য সূত্রের কথা বলেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ভাষা বিচারে পালকাপ্য সূত্র খুবই পুরাতন। "এখন কথা হইতেছে যে ঋষি বলিলেন। কাপ্য-গোত্রে আমার জন্ম—কিন্তু চেন্ত-সাল রাও সি. আই. ই. যে গোত্র প্রবর নিবন্ধ কদম্বম্ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্য গোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র প্রবরের গ্রন্থ এদেশে চলিত আছে

তাহার কোথাও কাপ্য গোত্রের লোক হইলেন, কি রূপেই বা তাঁহাকে আর্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে?……অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধহয় বাংলা-দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন।১৬ আমার মনে হয় 'কাপ্য' শব্দ সংস্কৃত 'কচ্ছপ' শব্দেরই একটি প্রকৃত রূপ। শব্দ-কল্পদ্রুমঃ কচ্ছপঃ শব্দ বলতে বলেছেন, "স্বনামখ্যাত জলজন্তু"—(কাছিম ইতি ভাষা) বাংলাদেশে প্রাচীন যুগে 'কচ্ছপ'কে টোটেম হিসেবে গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নয়। অমরকোষে দেখা যায় কচ্ছপের প্রতিশব্দ ছিল তিনটি—"কূর্ম্মে কমঠ কচ্ছপৌ"—এই তিনটি শব্দ আমাদের দেশেই চলে। কূর্ম, কাঠা, (কমঠ) এবং কচ্ছপ। মনে হয়, কচ্ছপঃ> কহ্পঃ <কঅপঃ> ক-পঃ বা কাপ্‌প, কাপ্য শব্দ এই 'কচ্ছপ' টোটেম থেকে এসেছে। পানিনির সময়ে অ' কার এবং আ' কারে বিশেষ তফাৎ ছিল না। কূর্ম বা কূর্মী গোত্র সৃষ্টিতেও সেই ধারণা লোক-মানসে কাজ করেছে। মাহাতোদের কৃষি কর্ম বা "কুর্মীর" জীবিকা সহজ ভাবেই কুর্মী গোত্রের জন্ম দিয়েছে; কাপ্য অর্থাৎ 'কচ্ছপে' স্থায়ী থাকেনি। এইভাবে কুর্মী মাহাতো বা মহা-মাত্রদের একটি অবলুপ্ত ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে। এইজন্য আমরা টুসু বিষয়ক প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে ঘুরে ফিরে এক মুনি বা ঋষির আবির্ভাব দেখেছি। বংশ পরম্পরার সেই পুরাতন কাহিনী, লৌকিক প্রথা, প্রচলিত ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অনুকরণ সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলেছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে আর্যভাষীরা, যাঁদের মধ্যে মহামাত্ররা অগ্রগণ্য, ইতিহাসের কোন্ সময়ে রাঢ় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল। 'রাজতরঙ্গিনী'তে আমরা দেখতে পাই কাশ্মীরের বহু রাজা নানা সময়ে বঙ্গ বিজয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। "Yosovarmana in his turn was defeated by Lalita-ditya, king of Kasmir, who had launched on a career of conquest, Lalitaditya is also credited by Kalhana with having defeated another gauda king and compelled the latter to give him his whole **elephant force** for his further progress. 17

কল্‌হন পণ্ডিত রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'তে এই রকম বহু রাজার সঙ্গে গৌড় দেশের সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। জয়াপীড়ের ইতিহাসে জানা যায়, "যথা সময়ে তিনি পৌণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করিলেন: এই নগর গৌড়

রাজ্যের অন্তর্গত।" তারপর "জয়াপীড় রাজলক্ষ্মী সাদৃশী কল্যাণদেবীর পানি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত বিক্রম প্রকাশ দ্বারা পঞ্চগৌড় পতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে সেই সকল রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন।"১৮

এইভাবে দেখা যায়, নানা সময়ে বাংলাদেশ বিচিত্রভাবে আর্যাবর্তের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। যে ভাবেই হোক, বাংলাদেশের হস্তী-যোদ্ধারা ভারত খ্যাত ছিল এবং ক্ষত্রিয় হিসাবে আর্য-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ছিল তাদের সম্পর্ক। এমনও হতে পারে আর্য-পূর্ব বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে বিশিষ্ট ভাবেই গড়ে উঠেছিল।

এত কথার মধ্যে আমরা এই কথাই বলতে চাচ্ছি—মাহাতোরা হলেন আর্য-ভাষীর একটি শাখা—যাঁরা মহামাত্র বা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে এখানে এসে এদেশের বসবাসকারীদের সঙ্গে একাকার হয়ে যান ও পরে তাঁরাই প্রাধান্য বিস্তার করেন। পরবর্তী বংশধররা সকলেই যোদ্ধা বা মহামাত্র হিসাবে আর মূল্য পাননি—তাই অন্ন-বস্ত্রের সন্ধানে মোটা পরিমাণ লোককে হতে হয়েছিল কৃষিজীবি।

মনে হয় পাল-কাপ্য-সূত্র বর্ণিত পালকাপ্যের পিতা যে করেণুকে বিবাহ করেছিলেন—তা রূপক অর্থেই ; এ দেশের কোনো রমণী—হয়ত তিনি প্রত্ন-কোল (Proto-kol) জাতির কেউ হবেন। পরে মহামাত্র সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মূল্য কমে যায়।

তবে অস্ট্রিক জাতির প্রাচীন প্রথা ও ঐতিহ্য একমাত্র সাঁওতাল বা খেরোয়াল জাতির মধ্যে বেশি পরিমাণ রক্ষিত ; তাঁদের আচার আচরণের মধ্যে বিস্মৃত দিনের প্রত্ন-কোল জাতির ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। মাহাতোদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রথা এখনও বিদ্যমান যে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠানে সাঁওতালদের একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে হয়। তাঁরা মাহাতোদের বিবাহতে একটি জলের পাত্র এনে রেখে দেবে। তা-না হলে বিবাহ সম্পূর্ণ হবে না। বাড়িতে কোনো অতিথি এলে অভ্যাগতকে পূর্ণ জলপাত্র দিয়ে অভ্যর্থনা করার এই রীতি কোল-গোষ্ঠীর। মাহাতোদের বিবাহে এইভাবে অংশ গ্রহণের প্রথার মাধ্যমে আভাসিত হয় সুদূর অতীতে হয়ত রাঢ়-বাংলার প্রত্ন কোল মানুষ বহিরাগত মহামাত্র নামধারী ক্ষত্রিয়দের সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

মাহাতো সম্প্রদায় ও টুসু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে—যদি তুষ্-তুষলি ব্রত থেকে টুসু এসে থাকে তবে মাহাতোদের জড়িয়ে এমন উপকথা ছড়িয়ে পড়ল কেন। কেন তাকে নিয়ে তৈরী হল না কোনো পাঁচালি। কৃষির সঙ্গে মিলিয়ে আপাততঃ লক্ষ্মীর পাঁচালির অনুকরণে কোনো পাঁচালি বা ব্রত কথা গড়ে উঠতে পারত। বরং টুসুর নামে প্রচলিত গীতি-সংগ্রহে দেখতে পাই বিশুদ্ধ মানবিক প্রেম সঙ্গীত। সম্প্রতি কিছু কিছু লেখক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে গান রচনা করতে গিয়ে দেবী বন্দনা ইত্যাদি রচনা করেছেন—এ জাতীয় প্রয়াস আধুনিক, কৃত্রিম। এ সমস্ত কিছু উদাহরণ আমরা সংগীত সংকলিকাতে রেখেছি। মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুকরণে কোনো ব্রত হয়ত কৃষি-ভিত্তিক সভ্যতাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল—কিন্তু তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে এখানকার লৌকিক শক্তিশালী উপাদানগুলির দ্বারা। সেই উপাদানগুলির অন্যতম হল কুমারী মেয়েদের পুতুল খেলা। আর টুসু শব্দটিও তুষ্-তুষ্‌লি জাত নয়—কোল-গোষ্ঠীর 'টুসাউ' অর্থাৎ টাটকা ফুলের গুচ্ছ। তারুণ্যের প্রতীক—উজ্জ্বল শুভ্রতার প্রতীক। পূর্বেই বলেছি চিরাচরিত টুসু উৎসবে মূর্তির বিশেষ স্থান নেই, ফুলের গুচ্ছ, কাগজের ফুলের চৌদল—সাঁওতালীতে যাকে বলে বাহা-টুসাউ। শেষকালে বলতে পারি 'টুসু' হল একটি সংকর ধারণা (concept)—যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, মহামাত্র সম্প্রদায় ও কোল গোষ্ঠীর (Austro-Asiatic) নানা উপাদান নিয়ে প্রস্তুত। আর বাংলা ভাষার সঙ্গে মাহাতো জাতির সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক। নব্য আর্য ভাষা বাংলাদেশের আকাশ পথে উড়ে আসেনি, তাকে এই সীমান্ত অঞ্চল বা টুসুর দেশ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মনে হয় মহামাত্র বা মাহাতো সম্প্রদায়ই এই অঞ্চলের প্রথম যুগের আর্য-ভাষী ক্ষত্রিয়। তাদের তৎকালীন আর্য ভাষার সঙ্গে প্রত্নকাল (Proto-Austro-Asiatic) ভাষার মিলনে যে নতুন ভাষার আবির্ভাব হল তাই প্রত্ন-বাংলার পূর্বরূপ। সীমান্ত বাংলায় এমন সব শব্দ পাওয়া যায় যাদের থেকে আধুনিক বহু বাংলা শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে।

যাই হোক বিহারে টুসু পরবে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। সিংভূম জেলার চাণ্ডিলের (জয়দা) দক্ষিণে টুসু পরবে দেখা যায় পুতুলের প্রাধান্য; অপর পক্ষে বুণ্ডু থেকে রাঁচি-হাজারিবাগ প্রভৃতিতে কেবলই চৌদল। পুতুল নির্মাণ ও তার বিচিত্র রূপ সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক কালের ঘটনা সন্দেহ নেই।

পম্পুঘাটের টুসু ঃ টুসু পরব দেখার জন্য ১৯৭৯ সালে পরবের এক দিন আগে থেকেই ধলভূম গড়ে উপস্থিত হলাম নরসিংগড় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে।১৯ সন্ধ্যা থেকেই বোঝা গেল পাড়ার মেয়েরা টুসু সঙ্গীতে তালিম দিচ্ছে—আগামী দিনের প্রস্তুতি হিসাবে, উচ্ছল আনন্দোৎ-সবের গান। ঢেউ খেলানো পাহাড়ি দেশের চড়াই-উৎরাই এর সঙ্গে মিলিয়ে সুর তৈরী হয়েছে স্বাভাবিকভাবে বহু যুগের ওপারে।

একটা ভুল সংবাদ পেয়েছিলাম, সুবর্ণরেখার তীরে কানাস বলে একটি জায়গায় টুসুর প্রতিযোগিতা হবে। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে খুব ভোরে সেখানে উপস্থিত হলাম। ধলভূম গড় স্টেশন থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটা পাহাড়, বন ও বাঁধ পেরিয়ে কানাসে যেতে হয়। সব মিলিয়ে হাজার খানেক লোক বসেছে অল্প কয়েকটা টুসু নিয়ে।

এখানে সুবর্ণরেখার সৌন্দর্য ভারি সুন্দর। এখন জল অনেক কমে গিয়েছে, স্রোতের তীব্রতা নেই বললেই চলে। শীতল স্বচ্ছ জলে আমরা স্নান করে একটা পাথরের চাঁই-এর তলায় বসলাম। এর নাম নাগ-নাগিনী পাথর। দেখতে কতকটা সাপের মত জলের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। দূরে, কাছে পাথরের ঘাটে লোকজন ও মেয়েরা গান করতে করতে চান করছে। কী চমৎকার সুর, কী অকৃত্রিম ভাষা। পৌষের শেষদিনে তারা তাদের স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবছে। দারিদ্র্য-পীড়িত বাঙালি সমাজের চিরন্তন সমস্যা সেই বিবাহ, বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে অল্প বয়স্ক রমণীর বিবাহ কিংবা আরো বিচিত্র সামাজিক বিষয় নিয়ে গান।

সামান্য দূরে একদল মেয়ে দু'হাত তুলে উন্মত্ত হয়ে টুসু সুরে গান গাইছে—

"এ বছরে মাঘ ফাল্গুনে কার কপালে কী আছে
বুড়া বরে গোঁফে তা দিছে।"

নাচ আর গান মিলিয়ে সেই সুবর্ণরেখার তীরে বিচিত্র রঙের শাড়ি-পরা এই টুসু গাইয়ে মেয়েদের দলটিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে ভিন্ন বলে মনে হলনা। প্রকৃতির রহস্যের আমরা কতটুকু জানি। এত উচ্ছল আনন্দ কোন্ শক্তির বহিঃপ্রকাশে। যে শক্তির বলে পাখি গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে এবং ঝরে পড়ে। আমি আমার দলের ভিতর দাঁড়িয়ে একটা ছবি নিলাম। কিন্তু তা তাদের চোখে ধরা পড়ে গেল। তারা গানের সুরে ছড়া কাটছিল—

"আমায় দেখে দেখে কত শীস্ মারে
ঐ দেখ ভাই সেই নদীর ধারে।—বোঝা গেল এটি একটি

পুরণো গানের কলি। কিন্তু অবাক হলাম যখন এক বয়স্কা রমণী জুড়েদিলে—

"উরা কেমন দাঁড়াই দাঁড়াই ফোটং তুলাইছে
কার কপালে কী আছে।

ইতিমধ্যে আমাদের দলের একটি ছেলে একটা পুরণো টুসু গান গাইতে শুরু করলে—

"তোরে কে দিলে লো নীল শাড়ি
চিংড়া মাছে হিলাইলোঁ দাড়ি॥"

এই গানটির একটি চমৎকার কিংবদন্তি আছে। অনেক আগে এক বুড়া পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ধলভূমগড় অঞ্চলে নাকি মোটর সারানোর ব্যবসা করতে এসে পাড়ার এক মেয়েকে ভালবেসেছিল। সেই মেয়ে নতুন শাড়ি পরে টুসু পরবে যোগ দিতে এসে কি বিপদেই না পড়েছিল পাড়ার অন্য মেয়েদের এই গানের ঘায়ে। এতে রস সৃষ্টির যে উপকরণই থাক না কেন বিচিত্র টুসু সঙ্গীতের কাছে এটা এমন নতুন নয়। তবু বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না রূপ কল্প সৃষ্টির শক্তি দেখে—বুড়া পাঞ্জাবী লোকের অতি হাল্কা রং করা দাড়ির কথা ভেবে চিংড়া (গলদা চিংড়ি) মাছের কল্পনার পেছনে বাহাদুরি আছে।

কানাস ঘাটে মোটেই টুসু পরব জমছে না। পরে জানা গেল টুসু প্রতিমার প্রতিযোগিতা কানাস ঘাটেই আগামী কাল হবে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষাতেই ছোটোছোটো প্রচার পত্র বিলি করা হচ্ছে। আমরা তা সংগ্রহ করলাম। অগত্যা আমরা যাত্রা করলাম পম্পুঘাটের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে চডাই-উৎরাই পেরিয়ে সোজা পশ্চিমে ঘণ্টা খানেকের হাঁটা পথে পম্পুঘাটে উপস্থিত হলাম। এতক্ষণে শীতের সূর্য সবে পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে। পম্পুঘাটে তখন হাজার হাজার লোক জমে গিয়েছে। শুধু গান আর গান। সেই সঙ্গে নাচ ও মাদলের বাজনা।

পম্পুঘাটে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। সেটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তা হল সাঁওতাল যুবক-যুবতীর টুসুতে দলে দলে যোগ দিয়েছে এবং সাঁওতাল ভাষাতেই টুসু সুরে গান গাইছে এবং হাতধরে নাচছে। তাদের সেই নাচের ভঙ্গী আমাকে সহারায় উৎসবকে স্মরণ করিয়ে দিল। টুসু পরবে সাঁওতালদের এইভাবে যোগদান এর পূর্বে আমি দেখিনি (এবং পরবর্তীকালেও অন্যত্র দেখিনি)। দ্বিতীয়তঃ দুর্গা প্রতিমার তুল্য সুবৃহৎ বহু টুসু প্রতিমা নির্মিত হয়েছে এবং টুসু গঙ্গারই এক অবতার এই হিসাবে তাকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে টুসু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-জাত দেব-

দেবীদের তালিকাভুক্ত হচ্ছে। একটি প্রতিমায় দেখা গেল শিবের কাছ থেকে ভগীরথ গঙ্গা আনছে টুসুর আকারে। এক মাঝ বয়সী মাহাতো ভদ্রলোকের কাছে টুসু বিষয়ক মৌল উপাদান সংগ্রহ করা গেল। এ এক নতুনভাবে টুসু পুরাণের আয়োজন।

সেই শীতের বিকেলে সুবর্ণরেখার তীরে বসেই ভারতীয় সভ্যতার হাজার হাজার বছরের পথ পরিক্রমার ইতিহাস আমার মনে উদঘাটিত হল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তীব্র আকর্ষণ ক্ষমতা এবং বিচিত্র উপাদান নিয়ে কেন্দ্রাতিগ (centripetel) করার শক্তি যুগে যুগে কীভাবে হিন্দু সমাজ গঠনে সাহায্য করেছে তাও পরিষ্কার হয়ে গেল পম্পুঘাটের টুসু পরব দেখতে দেখতে।

॥ টুসু সঙ্গীত-সংকলিকা ॥

(বিহার)

১. বড় বনে লতাপাতা
ছোট বনে বাতা গো
কোন্ বনে হারালে টুসু
সোনার বাঁধা ছাতা গো
বড় বৌকে শাঁখা দিলে
ছোটো বউ এর মন বাঁকা
ও বোনাই তোর পায়ে পড়ি লো
দিদির সতীন হব না ॥ (জন্হা / রাঁচি : ধর্ম্মালোহার)

২. এস কর পুষ্প রবে
ইঁদ্রা গাঁধি ভোট দিবে
জানতা সরকার রিজেন দিল
ইঁদ্রা গাঁধির জিৎ হৈল
ধন্য ইঁদ্রা গাঁধি
ভাল করে রাজ চালাবি—গো
বাপের বিটি ধন্য ইঁদ্রাগাঁধি ॥ (জন্হা, রাঁচি, ঘাসিরাম মাহাতো)

৩. (অপরিচিতা মেয়েদের টুসু দল থেকে সংগ্রহঃ জন্হা)
পরে তোরে দেব শিশু-বর
তারে এখন মালা বদল কর

সময় গেলে পস্তাবি তখন
টিপে দোব চ্যাং মাছের মতন।

৪. (মুখোমুখি দুই দলের টুসু তর্জা)
টুসু গীতে হারব না
গৌতম ধারায় তোকে ছাড়ব না
গৌতম ধারায় কি করি
চিৎ করে মুৎ খাওয়াতে পারি ॥

৫. (অপর দলের উত্তর)
লাগবি যদি ফিরে আয়
তোকে আমার কানে গোঁজা যায়।
কাঁচা কাঠে ভাত রাঁধে
ছানা কাঁদে ছানার মা কাঁদে ॥
দশটাকা জরিমানা
টুসু গানে কে করে মানা ॥

৬. গৌতম ধারায় দু'জনা যাব
একটি মিঠাই দু'জনা খাব।
আসবি বলে গেলি কোথা—
টুসুগীতে কে করে মানা—
তোর সহরে তোকে আছে জানা ॥

৭. (রাঁচি থেকে ট্রেনে জন্‌হা ফল্‌সে যাওয়ার পথে একদল টুসু যাত্রীর নিকট থেকে সংগৃহীত। টুসু যাত্রীর দল সাধারণতঃ মেয়েদেরই)
সাদি করব ফাগুন মাসেতে
এবার ভাল বেসেছি তোকে
লেখা আছে কালি কলমে ॥
গৌতম ধারার জলেতে
ফেলব না টুসু জলেতে—
ওরে মগর ধরবে ॥
সময় গেলে পস্তাবি তখন
কাগজ কলম রয়েছে বাবুর হাতে (লেখকের উদ্দেশ্যে)
যাবি গোলা দলকে দলকে (গোলা একটি জায়গা)
এখন তোরা গৌতম ধারায় চল।

টুসু গানে কে করে মানা
সতীঘাটে আর যাব না।
বাবু লেখে কাগজে কলমে (লেখকের উদ্দেশ্যে)
টুসুগান গাহিতে শরমে !
টুসুগানে কে করে মানা ॥

৯. সায়া শাড়ি সস্তায় বর
টুসু গেল ভাতার ঘর।
তিন টাকাতে তিনটা বর
সিলি যদি ছাড়ে বর। (-সিলি-পুরুলিয়া-রাঁচীর মধ্যবর্তী বিখ্যাত টুসুর জায়গা)
ভাবিস না গুণমণি
টুসু আমার চির কাঁদুনি।
কানে কানে কি সোনা
টুসু ভালবেসে দনুমনা
ছাড়াছাড়ি কেন করিস্ রে—
ওরে ছোড়া শিস্ মার কারে॥ (জনুহা)

১০. ফাগুন মাসে করব সাদি
এ কথা বুসে ভাবি॥

১১. পুন্না শাড়ি ইস্তিরি—
পরের ভাতার করবি যদি
সতীঘাটে নাচবি চল—
তোমার যাই বলিলে তাই বল
আমরা টুসু মেলা দু'জনে দেখিব (জনুহা)

১২. দিদি ভালো দাদা ভালো না
দাদা সিলিক কাপড় দিবে বলে
কাপড় দিল দর-বোনা—(বহড়াগড়া)

১৩. এ বছরে মাঘ ফাগুনে
কার কপালে কি আছে
বুড়া বরে গোঁফে তা দিছে
আমায় দেখে দেখে কত শিস্ মারে
ঐ দেখ ভাই ঐ নদীর ধারে॥ (কালাস ঘাট, সুবর্ণরেখা)

১৪. মাঝ বনেতে কে বাজায় বাঁশি
মন হল মোর উদাসী
বিষ্ণুপুরে বাজল বাঁশি
আমরা হেতায় হায় শুনি
কোন্‌খানেতে পরাণ জুড়াইগুনি।
কার কাছে জুড়াই এ জীবন।
যার কাছে যাই সে হয় বিষের মতন ॥ (কানাস্/টুসু মেয়ের দল)

১৫. চল টুসু সিনাত্ যাব
কুলিতে পথ বাঁধাব
বাঁধের জলে সিনান করে
ঝরণায় চুল শুকাবো।
আঁতা রঙের কাপড় মোরা
চালতা রঙে গাবাব।
পাড়ার মাঝে টাঙিয়ে দিয়ে
যত টুসুকে বাগাব ॥ (পম্পুঘাটের নিকট সুবর্ণরেখা)

(বিহারে মুদ্রিত টুসু-গানের বই যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়। এগুলি শিক্ষিত লোকের রচিত গান। ফলে সাধারণভাবে গ্রাম্য নরনারীর মুখে মুখে রচিত গানের তুলনায় কিছুটা কৃত্রিম, অলঙ্কার যুক্ত (sophisticated) এবং বাংলা পাঁচালি ইত্যাদিকে কিছুটা অনুকরণ করে লক্ষ্মী বন্দনা দিয়ে শুরু। চিরাচরিত টুসু গানের মুখ্য বিষয়—প্রেম, সমাজ জীবনের বেদনার বহিঃপ্রকাশ, উচ্ছল স্থুল-প্রেমের অশ্লীল ইঙ্গিতও যথেষ্ট পরিমাণ দেখেছি, এমন কি মেলার ভীড়ে যুবক-যুবতীরা নাচ ও গানের মাধ্যমে অনেক কাছা-কাছি এসে যায়। টুসুকে সঙ্গীত ও শিল্পের মধ্য দিয়ে দেবী হিসাবে অঙ্কিত করার প্রয়াস দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এখানে ঐ জাতীয় কয়েকটি পুস্তক থেকে আধুনিক টুসু গান পাঠকদের উপহার দেওয়া গেল। কয়েকটি টুসু গানের বইএর নামও এখানে দেওয়া গেল :

১. বাদাবাদি টুসু-সঙ্গীতঃ কবি শ্রীসন্তোষকুমার পাত্র। ইম্‌প্রিন্ট, ঘাটশিলা।

২. আধুনিক রং যৌবন টুসু সঙ্গীত—মহাদেব চন্দ্র নায়েক

৩. প্রেম বিলাস টুসু সঙ্গীত—মহাদেব চন্দ্র নায়েক
চাকুলিয়া আর্ট প্রেস

১. লক্ষ্মী বন্দনা ঃ

বন্দি মায়ের দুটী চরণে ।
অভাব ঘুচাও মা আশীর্ষ-দানে ॥
কত রূপে রূপ ধরমা যায় না গো এ কহনে ।
আমি কি বর্ণিব মাগো পারেনা পণ্ডিত জনে ॥
এ বিশ্ব মাঝারে তুমি রাখিও মা কল্যাণে ।
সন্তোষ ভনে নিজ গুণে রাখো মা চোখের কোণে ।

২. সরস্বতী বন্দনা ঃ

মাগো তোমার অশেষ করুণা ।
আমায় চরণ ছাড়া করোনা ॥
হংসরথী মাগো আমার কোলেতে প্রেমের বীণা ।
সদাই মনে ঐ চরণে পূজিতে মা বাসনা ॥
শ্বেত কমলে শ্বেতাঙ্গিনী কি দিব মা তুলনা ।
কণ্ঠে এসে এ সন্তোষে বলে দাও মা গানখানা ॥

৩. পাগল কেন ঐ বন ফুলে
ঘরে থাকবিরে মন কি দিলে ।
যতন করে বুঝাই তারে পড়বিরে মহাজালে
সযতনে মনে মনে রাখিয়াছি জাল ফেলে ॥
করলে মানা মন থামেনা ঢুকতে চায় যাঁতাকলে ।
ছলে বলে কলকৌশলে ধরবে মন সন্তোষ বলে ॥

৪. ভালবাসা বল কারে বলে ।
ও তুই 'বুঝবি ধনী শেষকালে ॥
তালে তালে বঁধুর গলে ফুলমালা পরাইলি
বুঝবি সেদিন ভাসবি যেদিন অগাধ সাগরের জলে ॥
ভাল কথায় মিষ্টি কথায় ভালতে বিষ মিশালে ।
অতি ভাল হয় গো কালো শেষকালে সন্তোষ বলে ॥

৫. ভয় লাগে যদি গোল খোঁপা দেখি ।
আমি তাই তো গো লুকাই থাকি ॥
দেখব দেখব মনে হলে মনকে গো বুঝাই রাখি
আজ বিকালে দেখা দিলে মন কাঁদে থাকি থাকি

এ যৌবনে দিনে দিনে ইংগিত মারো মান রাখি।
সন্তোষ ভনে এ যৌবনে ধৈর্য ধরা দায় সখি॥

৬. আমার কথা রাখবি গোপনে
মনে করবি লো হাটের দিনে॥
হাতে হাতে পান খিলি দি মন বুঝে মানুষ চিনে।
মনে হলে নয়ন জলে ভাসতে থাকি এক মনে।
আহা মরি ও মাধুরী করলি যাদু নয়নে।
সন্তোষ ভনে টুসুর গানে সহে না আর পরাণে॥

৭. মহাদেব চন্দ্র নায়েকের রচনা ঃ—

॥ সরস্বতী বন্দনা ॥

নমঃ মাতা কমলে বদনী।
আমি পূজি চরণ দুখানি।
অবলারে বলাও মাগো তুমি বিদ্যাদায়িনী।
আমি অতি মূঢ়মতী, করগো আমায় জ্ঞানী॥
কৃপা করে তুমি মোরে বলাও মাগো জননী।
ধূপ ধুনা দিয়ে চরণ পূজিব দিবা যামিনী।
তোমার ভরসা পেয়ে লিখিলাম টুসুর বইখানি॥

৮. ধৈর্য ধরে থাকব কেমনে।
মধু জমেছে হে যৌবনে॥
মনের আশা হয় পিয়াসা মিটাব আর কার সনে।
দিনে দিনে হচ্ছে ব্যথা আমার কাঁচা যৌবনে॥
মন ভ্রমরা এবার তারা আসবে হে মধু পানে।
ভরা মধু পাবে বধু পান করিব যতনে॥
একা ঘরে রহিতে নারি, ঘুম ধরেনা নয়নে।
টুসুর গানে মহাদেব ভণে আইস তবে আমার সনে॥

৯. ভুল করে কেউ পীরিত করনা।
পীরিত লাগলে পীরিত ছাড়বে না॥
জোয়ানকালে পুছবে সবাই, বাসবে ভাল সব জনা।
অবশেষে পুছবে না কেউ ভেবে গুণে দেখনা॥
সাদা গায়ে কাদা ধনি অকারণে নিওনা।
প্রেমের নেশা লাগলে পরে নেশার দিশা থাকেনা॥
প্রেম-পীরিতি এমনি রীতি চিরদিন কেউ রাখেনা।
অবশেষে কুলে কালি নিওনা গো নিওনা॥

সত্যিকথা যৌবন ব্যথা অবুঝা সব বুঝে না।
টুসুর গানে মহাদেব ভণে আমার কথা ভুলবি না॥

১০. আঁখির জলে ভিজল বিছানা।
বঁধু আসব বলে এলে না॥
তোমার প্রেমে প্রাণ কাঁদে রহিতে নারি তোর বিনা।
প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ জল ঢালিলেও নেভে না॥
বারে বারে বাঁশীর সুরে ডেকোনা আর ডেকোনা।
ও বাঁশের বাঁশরী তুমি আর কারুর নাম জাননা।
মনে করি ধৈর্য ধরি মন বুঝাতে পারিনা।
মহাদেব বলে টুসুর গানে পুরাও মনের বাসনা॥

১১. চোখ ইশারায় যাবি বন ধারে।
তোকে বলছি গো বারে বারে॥
গোপনেতে যাবি যেন, জানেনা গাঁয়ে ঘরে।
ভুলবি না দেখ আমার কথা রাখবি সদা যত্ন করে॥
ধৈর্য ধরে রহিতে নারি না দেখিলে তোমারে।
দেখা দিয়ে জুড়াও জ্বালা বসাও হৃদয় মাঝারে॥
কি মহিনী দিয়ে ধনি ভুলালে গো আমারে।
টুসুর গানে মহাদেব ভণে পাগল আমি তোর তরে॥

১২. ডুবল ডিঙ্গা নদীর কিনারে।
যেমন শোল মাছে উঝাল মারে॥
নব কচি ঐ যুবতী ডাক দিচ্ছে ভাই হাত ঠারে।
যৌবন বিরহ জ্বালা সহিতে আর না পারে॥
শাহালা গাছের আড়ালে যে কে সময় জানে শিক মারে।
মহাদেব ভাবে বদনাম হবে দেখ নিত্য সংসারে॥

বাংলাগানের এই জাতীয় দৃষ্টান্ত বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। বিহারের টুসু উৎসবগুলিতে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় গান শুনিনি। শুধু ব্যতিক্রম দেখেছি পম্পুঘাটে। এখানে কয়েকটি সাঁওতাল ভাষায় টুসু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। বলাবাহুল্য এ প্রয়াস সম্পূর্ণ আধুনিক। সাঁওতাল জীবন-যাত্রার সঙ্গে টুসুর সরাসরি সম্পর্ক ছিলনা। সাঁওতাল ভাষায় যে সব গান পাওয়া গেছে সেগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাঁওতাল জন জীবন থেকে উদ্ভাসিত হয়নি। ফলে সঙ্গীতে লিখিত টুসু সঙ্গীতের অনুকরণ লিখিত হয়॥

১. সরস্বতী আয়োঞ্ গভাম্ আবন।
রিদোঁ আম্‌গে আক্লোম্ ইমাঞা॥
ধুপ বাত্তিয়ো আতীরকাতে আমগেঞ্: সরনামা।
কংকা হড়বাঞ্ বাড়ায়া, অয়ো আমাঃ মহিমা॥
আমাঃক্ দায়াতেগে অয়ো কুবুদ্ধি মাহাঃক্‌তিঞ্ হা।
আমাঃক্ দাড়ে জেগে আয়ো সেরেঞ্ পুঁথিঞ উছানা॥
হরবার করে দুখ্ বিপদ্‌রে আমগেয়োম পারমিঞা।
আয়োয়াঃক্ জাঙ্গা জাপাঃক্‌রে মাণ্ডি নেহেরঃকানাঃ॥

(যতদূর জানা গেছে বিহারের গুনারাম মাণ্ডী নামে এক ভদ্রলোক এই জাতীয় কিছু গান রচনা করেছেন। এই সমস্ত গানের রেকর্ড ও বর্তমান লেখকের সংগ্রহে গ্রন্থিতে আছে।)

সরস্বতীমাতা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও। ধুপ বাত্তি জ্বালিয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। মূর্খ আমি, আমি জানিনা তোমার মহিমা। তোমার দয়ায় যেন আমার বুদ্ধি বা ধী শক্তি জাগ্রত হয়, তোমার শক্তিতেই আমি গানের বই বার করছি। পথেঘাটে সুখেদুঃখে তুমিই পার করবে। মা-তোমার পাদপদ্মে মাণ্ডী প্রণাম জানাচ্ছে॥

২. গরীব দুঃখী হড়াঃক্ হাহাকার।
পাজী এন্তেগে ক ঠিকাদার॥
উনীঃক্ যেবন খাটাঃক্ কানা আবগে শহর বাজার।
রেঙ্গেচ্ তেতাং দেয়াকাতে জাঃচ্ লাগিঃৎ আত্তায়র ধাপার॥
কম বেতনেতে অভার টাইম খাটাও মেয়ায় মিরৎ লেতাড়।
খাটাঃক্ হোয়ঃক্ দাড়েতেক মারাংঅঃক্ কান্ বারেবার।
লেদাগাছে ভালুক নাচে নওয়া দ সারি উত্তার॥
মাণ্ডি লাইয়া নওয়াকদ আর দাস্ আয়াবন সরকার।
নংকোতেদ টিকাতেদ চালাঃক্ তালেয়া সংসার॥

(গরিবদুখী মানুষের সব দিনই হাহাকার। কারণ আমাদের দেশের ঠিকাদারেরা ভালো নয়। আমরা যে এত পরিশ্রম করে চলেছি শহরে বাজারে, অনাহারে ক্ষুধায়, পেটের জন্য তবু অল্প বেতনে ওভারটাইম খাটিয়ে নেয়। (অথচ) আমাদের যে বেশি সময় কাজ করতে হবে তার কোনো নিয়ম নাই। ওরা আমাদের শোষণ করেই ধনী হচ্ছে। কথায় বলে লেদা গাছে ভালুক নাচে। এটা একেবারে সত্য কথা। মাণ্ডি কবি বলেছে, চুপ

করে থাকলে আমাদের আর চলবে না। এইসব ঘটনা আমরা সরকারের কাছে জানাব।—এভাবে আমাদের সংসার চলবে কি করে।)

সাঁওতালী ভাষায় এইভাবে টুসুগান রচিত হচ্ছে ও প্রচলিত টুসু সুরে তা গাওয়া হচ্ছে। এছাড়া সেরাই-কেলা অঞ্চলে টুসু পরবে উড়িয়া গান গাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। তবে এখনও সে সব গান সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

টুসু পরবের

আঞ্চলিক সমীক্ষা

পুরুলিয়ায় টুসু পরব ও চৌড়লের ব্যবহার

স্বষ্টিধর মাহাত

গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, পুরুলিয়ার জমি অসমতল ও কঙ্করময়। ছোট ছোট ডুংরী-পাহাড় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে। দল্মা-পাঞ্চেৎ-অযোধ্যা তার মধ্যে প্রধান। প্রকৃতির কাছ থেকেও আমরা পুরুলিয়াবাসীরা পেয়েছি রুক্ষতা। মাটির সঙ্গে মনের সম্বন্ধ স্বীকার করলে বলব: এই রুক্ষতার উপরেও আমাদের একটা নিজস্ব সত্তা আছে; তা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের কথা। অবহেলার চোখে না দেখলে সত্যই তা হৃদয়গ্রাহী। আমাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, হাজারো অভাব অনটনের কথা কে না জানে! শত দুঃখ দৈন্য আমাদের ভাবাবেগে বাধা হতে পারেনি। হৃদয় ও অন্তর ছোট না হওয়ার জন্য হৃদয়াবেগে ঝুমুর, ধানলাগার গান, দাঁড়শাল, ভাদু, অহিরা, বিয়ের গান ও টুসু গান বেরিয়ে এসেছিল।

বলতে গেলে এখানের মানুষের প্রধান উপজীবিকা চাষ। চাষ ব্যতিরেকে জীবন ধারণের আর কোন বিকল্প পথ নেই। বিভিন্ন সময়ে ফসল তোলা ও ফসল বোনাকে সামনে রেখেই নিজেদের মনের ভাব-ভালোবাসার কথা আনন্দ-বেদনার কথা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পুরুলিয়ার বিভিন্ন গান ও ছড়াগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে।

বাড়িতে ফসল তোলার গানেই শুরু হয় পুরুলিয়ার 'টুসু' গান। 'টুসু গানে সমাজ সচেতনতা'য় শ্রীঅজিত মিত্র লিখেছেন:

"বলা বাহুল্য, টুসু একটি শস্য উৎসব। post harvest এর message সে নূতন ধানের গন্ধ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি; লোককথার চিরন্তন অভিপ্রায়গুলি প্রতিফলিত করেছে অশিক্ষিত প্রতিভাবানদের গানে আর ছড়ায়। ······আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সচিত্র বর্ণনা পাই টুসু গানে।"

আমি একবার আমার দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা দাদু! লোকে টুসু পরব করে কেন! আর টুসু ভাসার সময় হাতে হাতে চৌড়ল নিয়ে যায় কেন?" দাদু আমার প্রশ্নের জবাবে যে গল্পটি বলেছিলেন সেই গল্পটিই ছোট করে এখানে বলছি। জানিনা দাদুর সে দিনের গল্পটা সত্য কি না। কিন্তু তাঁর মানভূমের প্রবাদ, গান, ছড়া ও লোকগাথার উপর যেরূপ দখল ছিল; তা'তে করে তাঁর কথা

সহজে উড়িয়ে দিতে পারি নি। আজও টুসু সম্বন্ধে অনুরূপ গল্প এখানে ওখানে শুনতে পাওয়া যায়।

গল্পটি এই :

ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল মহলে কোন এক গ্রামে এক কুর্মী জমিদার বাস করতেন। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। সে দেখতে যেমন ছিল সুন্দর, স্বভাব ও কাজকর্মে ছিল অনুরূপ। মেয়েটির নাম ছিল 'টুসু'। সবাই তাকে আদর করত, ভালোবাসত। লোকে বলত কোন দেবকন্যা হবে হয়ত। ভুল করে মানুষের ঘরে জন্মেছে। তা' না হলে এত রূপ গুণ মানুষের হয় কখনো। রাজার ঘরে রাজকন্যা ঘর আলো করা মেয়ে।

নানা কাজের মধ্যেও বাগান করার বাতিক ছিল মেয়ের। তাই জমিদার মেয়ের জন্য আলাদা বাগান তৈরি করে দিয়েছিলেন। যেখানে 'টুসু' ও তার সহচরী ছাড়া কেউ কখনো যেতে পারতো না।

সেই সময় দিল্লী ও গৌড়ে মুসলমান বাদশাহদের শাসনকাল চলছিল। গৌড় সম্রাটের একমাত্র ছেলের অসুখ করল। অনেক ডাক্তার, হাকিম, বৈদ্য ছেলেব চিকিৎসা করল। কিন্তু অসুখ সারল না। বাদশাহ আকুল হয়ে এক জ্যোতিষীর স্মরণ নিলেন। জ্যোতিষী এসে গণনা করে বললেন, "রোগ সারবে। তবে গাছে পাকে না এমনি আম, আর পুকুরে ফোটে না এমনি পদ্ম ফুলের দরকার। এই দু'টি দ্রব্য এক সাথে বেঁটে খাওয়াতে হবে। তবেই রোগ সারবে।"

কথা মাত্র কাজ। দিকে দিকে লোক খুঁজতে বের হল। কোথায় অনুরূপ আম ও পদ্ম পাওয়া যায়। দিন যায় কিন্তু কেহই সন্ধান আনতে পারে না। এ দিকে দিন দিন বাদশাহের ছেলের অবস্থা দুর্বলতর হয়ে মৃত্যুর জন্য দিন গুণতে থাকে। বাদশাহ ভীষণ ভাবনায় পড়ে যান। রাতে ঘুম নেই, খাবারে নেই রুচি।

প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করে দেশে দেশে আরও অধিক জন ঘোষক পাঠালেন। এক দিন কুর্মী জমিদারের এলাকায়ও ঘোষক এসে পৌছাল। কথা প্রসঙ্গে জমিদার কন্যা টুসুর কানে খবর এসে যায়। খবর শোনা মাত্র টুসু ছুটে যায় বাবার কাছে। সে জানায় তার বাগানে তাওয়ায় রাখা পদ্ম ফুল ফুটেছে, বোতলে রাখা আমে পাক ধরেছে। বিধির কলম কে খণ্ডন করতে পারে? টুসু বাবার কাছে বায়না ধরলে বাদশাহের লোককে ঐ ফুল ও ফল দিয়ে দিতে। জমিদার অবাক হয়ে যান কবে তার আদরিণী কন্যা এতসব করেছে। জানে বাগান করতে, বাগানে বেড়াতে টুসু বড় ভালোবাসে। তাই পছন্দ মতো বাগান তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু জমিদার

ঐ ফুল-ফল দিতে চাইলেন না। তিনি কন্যাকে বোঝাতে চাইলেন এবং বললেন, "কি হবে মা দিয়ে? ওযে মুসলমান, কখন কি বিপদ বাধায়।"

টুসু জীদ্ ধরে বসে বলে, "বাবা! যদি আমাদের জিনিস মানুষের কোন উপকারে লাগে, লাগুক না। আমাদের আর কি ক্ষতি হবে? তা ছাড়া মেয়েদের কাজই তো রোগী ও আর্তের সেবা করার জন্যে। শোকে সান্ত্বনা, কর্মে প্রেরণা দেওয়াই তো আমাদের জীবনের সার্থকতা। আমার পরিশ্রমের জিনিস দিয়ে আর এক জনের জীবন বাঁচবে, এতো বড সৌভাগ্যের কথা। শুনেছি, বাদশাহের একটি মাত্র ছেলে, সে মারা গেলে বাদশাহ কতই না দুঃখ পাবে। ছেলের বাবা হয়ে কেমন করে তা সহ্য করবে? আমি যদি—"

জমিদার মেয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "তোকে নিয়ে পারা দায়। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এত কথা কে তোকে শেখালে? আমাকে তুই হার মানিয়ে দিলি।"

বাবার অনুমতি আদায় করে নিজে বাগান থেকে আম ও পদ্ম এনে টুসু পরিচারিকার হাতে দিয়ে বাদশাহের লোকের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

ঔষধ তৈরি করে বাদশাহের ছেলেকে খাওয়ানো হল। ছেলে সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর বাদশাহ জমিদারের বাডিতে লোক পাঠালেন জমিদার কন্যা কি পুরস্কার পেলে খুশী হয় তা জানতে। টুসু বললে, "আমার পুরস্কারের কোন দরকার নাই। বাদশাহের ছেলে রোগমুক্ত হয়েছে। এই তো আমার বড পুরস্কার। অন্য পুরস্কার আমি চাই না। আমার বাগান করা এতদিনে সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য হয়েছি।"

বাদশাহের দূত গৌড়ে ফিরে গেল। সেখানে বাদশাহের দরবারে কুর্মী জমিদার-কন্যা টুসুর গুণপনার কথা বললে। দূতের কথা শুনে পাত্র-মিত্র সকলে যুক্তি দিল, এইরূপ গুণবতী কন্যার সঙ্গে বাদশাহের ছেলের বিয়ে হলে ভালো হয়। বিপদ কোন দিন স্পর্শ করতে পারবে না। সভাসদ্গণের কথা বাদশাহের মনে ধরল।

আবার তিনি কুর্মী জমিদারের নিকট দূত পাঠালেন, বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। জমিদার মুসলমান বাদশাহের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। তিনি বাদশাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন।

দূতের মুখে সংবাদ শুনে বাদশাহ অপমানিত বোধ করলেন এবং সৈন্য সামন্ত নিয়ে কুর্মী জমিদারের মেয়েকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার জন্য ঝাড়খণ্ডের দিকে রওনা হলেন।

প্রবলপ্রতাপ বাদশাহের কোপদৃষ্টি থেকে নিজের মান-সম্মান বাঁচানোর জন্য কুর্মী জমিদার সপরিবারে গভীর জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যান। বাদশাহী সৈন্যও পিছনে ধাওয়া করে।

জঙ্গলে সেই সময় সাঁওতালগণ জমায়েত হয়ে পাতাপূজা করছিলেন। শ'য়ে শ'য়ে শুকর বলি দেওয়া হ'য়ে গেছে। নাচ গান চলছে পুরোদমে। এমন সময় জমিদার তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সাঁওতালরা জমিদারকে আদর করে বসাল। সাঁওতাল মেয়েবউরা টুসুকে পেয়ে তাকে পূজার রানী বলে গ্রহণ করলে। জমিদারের মুখে সমস্ত খবর শুনে সাঁওতালরা কথা দিলে জীবন দিয়েও তারা জমিদারকে রক্ষা করবে। সবাই জমিদারকে ঘিরে বসল। তীর ধনুক নিয়ে সবাই তৈরি হ'য়ে থাকল।

সাঁওতালরা এক প্রস্তাব করে বসল, জমিদার কন্যা টুসু যেন প্রথম খাবার পরিবেশন করে। টুসু রাজি হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে টুসুও ভোজের সামগ্রী পরিবেশন আরম্ভ করে দিলে। ভোজ শেষ হয় নি, অমনি বাদশাহী সৈন্য "আল্লাহো আকবর" বলে চিৎকার করে উঠল।

সাঁওতালগণ খাবার ছেড়ে তীর-ধনুক, মাদল-নাগড়া নিয়ে দাঁড়াল। ঘন ঘন নাগড়ায় কাঠি মারতে থাকল। সাঁওতালরা বিপদের আশঙ্কা কিম্বা জরুরি কোন কাজ আছে সেই জন্য যে যেখানে আছে ছুটে এসে জমায়েত হল। যখন সাঁওতালদের খুব কাছাকাছি বাদশাহী সৈন্য এসে পড়ল তখন তারা দলপতির নির্দেশে তীরের ফলায় শুকরের মাংস লাগিয়ে বাদশাহী সৈন্যের দিকে ছুঁড়তে লাগল। মুসলমান সৈন্য "তোবা, তোবা!" বলে পিছু হটে পালিয়ে গেল। বাদশাহী সৈন্যের হাত থেকে জমিদার পরিবার রক্ষা পেল এবং সাঁওতাল গোষ্ঠির সঙ্গে কুর্মী গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠল। সাঁওতালেরা কুর্মী জমিদারকে রাজা বলে গ্রহণ করে নিল।

কিছু দিন পর জমিদার কন্যা টুসুকে পাত্রস্থ করার জন্য যত্নশীল হলেন। কিন্তু টুসুর মনে শান্তি নেই। সে বুঝতে পেরেছে একবার যখন বাদশাহের কোপদৃষ্টি তার উপর পড়েছে, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আজ হউক কাল হউক ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে তাকে নিয়ে যাবেই। মুসলমানের ভাত তাকে খেতেই হবে। যেখানে তার বিয়ে দেওয়া হোক স্বামীহারা তাকে হতেই হবে। বৈধব্য যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা, এ জ্বালা সে সহ্য করতে পারবে না। ভাবনার শেষ নেই। একদিন কাউকে না জানিয়ে জল আনার নাম করে কাঁসাই নদীর জলে আত্মবিসর্জন দিলে। তীরে টুসুর সখীরা চিৎকার করে কান্না জুড়ে

দিল। বাদশাহ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেই এলেন কুর্মী জমিদারের কাছে ক্ষমা চাইতে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। ক্ষমা চেয়ে আর কোন লাভ নেই। তবুও বাদশাহ জমিদারের কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন।

পরে টুসুকে দেবমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে কাঁসাই নদীর ঘাটে যেখানে টুসু আত্মবিসর্জন দিয়েছিল সেখানে কুর্মী, সাঁওতাল ও মুসলমানগণ মিলিত শোক মিছিল করেন। এবং প্রতি বছর পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন ঐ শোক উৎসব পালন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। প্রতিশ্রুতি মত আজও প্রতি পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসু উৎসব চলে আসছে।

কুর্মী, সাঁওতাল ও মুসলমানের মিলিত টুসুর শোক উৎসবের প্রতীক চৌডল ব্যবহার করা হয়। বিবাহকে কেন্দ্র করেই ভুল বোঝাবুঝির জন্য টুসুকে হারাতে হয়েছিল ; সেই জন্য কুর্মী ও সাঁওতালদের বিবাহে ব্যবহৃত চৌদল ও মুসলমানদের শোক উৎসবের প্রতীক তাজিয়ার মিলিত রূপেই টুসুর প্রতীক চৌড়ল। আজও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মাহাতো, ভূমিজ, সর্দার, কামার, কুমার, বাউরী, মহিম, রোহিদাস, দেশওয়ালী, সাঁওতাল ও মুসলমান সকলে এক সঙ্গে চৌডল হাতে নিয়ে টুসু পরবে সামিল হয়।

বাঁদনা পরবের চতুর্থ দিনে কাঁটাকাড়ার দিন শেষে টুসুর গানের প্রথম রেগ তোলার প্রথা আছে। তবে প্রধানত অগ্রাহয়ণ সংক্রান্তির পর অর্থাৎ ১লা পৌষ প্রথম টুসু পাতা হয়। সন্ধ্যায় চিঁড়ে ভাজা, চালভাজা, কুথিভাজা টুসুকে ভোগ দেওয়া হয় প্রতি সন্ধ্যায় কুলুঙ্গিতে ফুল দিয়ে টুসুর পূজা করা হয় এবং বাড়ির কাজ শেষ করে মেয়েরা দাওয়ায় বসে টুসু গান গাইতে আরম্ভ করে। পৌষ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন টুসুকে পুকুর-নদী কিংবা অন্য কোন জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হর। সংক্রান্তির দিন এই ভাসান উৎসবই টুসু উৎসব বা "টুসুপবব"।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুসুকে ফুল দেওয়ার সময় এবং ভাসানের সময় যে গানগুলি গাওয়া হয় তাই টুসু গান। এই সময় ছাড়াও হাটে-মাঠে-ঘাটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে টুসু গান গাওয়া হয়। গান গাওয়ার কিছু বিধি-নিষেধ নেই। টুসু গান শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অতি সহজেই বাঁধতে পারেন। এত সহজ-সরল সুরে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করার আর কোন গান নেই বললেই চলে।

"টুসু পরব" পুরুলিয়ার সব চাইতে বড পরব। এত সাড়া-জাগানো উৎসব আর দু'টি নেই। সকলেই চায় নতুন কাপড়। বছরের এই কয়েকটা দিন সকলেরই

সচ্ছল অবস্থা থাকে। সীম পিঠা, লাউচকলি, গড়গড়্যা পিঠা খেয়ে মুখে পান গুঁজে হাতে চৌড়ল নিয়ে গান গাইতে গাইতে টুসু ভাসাতে সকলে বের হয়। সকলেরই মুখে হাসি ও গান। কারো মুখ মলিন নয়। কথায় বলে "রাঁড়ে ভাঁড়ে পৌষ পিটা।" মকরের দিন পুরুলিয়ার গানের দিন। আকাশে-বাতাসে শুধু টুসু গান ও বাজনা, আজ কাজ নয় শুধু গান। এখানের মানুষ গান ধরে রেখেছে, না গানই এখানের মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলা শক্ত।

মকর সংক্রান্তির আগের দু'দিন চাঁউড়ি ও বাঁউড়ি, টুসু পরবের প্রস্তুতির দিন। নতুন জামা-কাপড় কেনাকাটা, নাড়ু তৈরি করা, তিল পিঠের জন্য অন্যান্য সামগ্রী জোগাড় করা ঐ দিনের প্রধান কাজ।

মালাকার ও যোগী সম্প্রদায় শোলা ও রঙবেরঙের কাগজ দিয়ে চৌড়ল তৈরি করেন। অনেকে আবার ছোট ছোট মাটির মূর্তিও তৈরি করেন। ২।৩ টাকা দামে বিক্রয় করেন। সৌখিন দলগুলি ৫০।৬০ টাকা দিয়ে বায়না করে চৌড়ল তৈরি করান। বাঁওড়ির রাত টুসু জাগরণের রাত। ঐ দিন চৌড়ল কিনে এনে নিজ নিজ দল চৌড়লকে জাগায়। সারারাত ধরে গান করে, টুসুর আরাধনা করে। শিশু, মেয়েরা, মধ্য বয়স্কা এমন কি বৃদ্ধারা পর্যন্ত হাতে চৌড়লের মধ্যে টুসু পূজার ফুল নিয়ে টুসু গান করে টুসুকে বিসর্জন দিতে যায় বাঁধে, নদীতে।

অন্যদিকে পুরুষ মানুষেরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। ঢোল-ধামসা-সানাই-বাঁশী বাজিয়ে টুসু গানের রেগ তুলে লাল গামছা জড়িয়ে নাচতে নাচতে টুসু পরবে নিজেদেরকে সামিল করে নেয়।

প্রধানত শ্রীলাইদহ, ডমিনদহ, বাঁধা পোল, সতীঘাট, দেউলঘাটা চাপাইসিনী, সীতা পাজে, নরকুলদহ ইত্যাদি স্থানে জোর টুসু মেলা বসে। এ ছাড়া আরও অনেক জায়গায় টুসু পরব অনুষ্ঠিত হয়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী টুসু গানের সুর ও কথার প্রচুর প্রকারভেদ আছে। এক এক পংক্তি কি দুই পংক্তি গান গাওয়ার পর এক রং গান গাওয়া হয়। তাকে টুসু গানের রেগ বলা হয়।

এইতো গেল টুসু পরবের কিছু আলোচনা। এর পর টুসু গান বিষয়ে দু'এক কথা না বললে টুসু উৎসবের অনেক কিছুই বাদ পড়ে যেতে বাধ্য।

টুসু উৎসব এখানের মানুষের কত বড় আপন একটি গানেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। মকর পরবে মেয়ে শশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ী যেতে পারেনি বলে তার অন্তরে বড় ব্যথা। ব্যথাতুর হৃদয়ে মনের খেদে তাই গায়ঃ

ধুয়া : "এত বড় পৌষ পরবে,
লাখলি মা পরের ঘরে।
পরের মা কি বেদন জানে,
অন্তরে যারে মারে॥"

রেগ : "ছুটুই বিহা দিলি মা কেনে,
আমি ঝাঁপ দিব নদীর বানে॥" এই অঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু বাল্যবিবাহ সকল সময় সুখের হয় না। পরিণত জীবনে দুঃখ পাচ্ছে বলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আত্মহত্যার কথা প্রকাশ করে উপরোক্ত রেগের আকারে বেদনার কথা প্রকাশ করেছে।

ধনবান লোকের বাড়িতে মা-বাবা মেয়েকে বিয়ে দিতে চান। এখানে স্যাঘা (দ্বিতীয় বিবাহ) প্রচলিত আছে। মেয়েরা গয়না ভালোবাসে। নিচের গানগুলিতে তাই ধ্বনিত হয়েছে :

ধুয়া : "জল ফেলায়ে জলকে যায় মা,
ঘন ঘাটে সরুবালি।
আমার টুসুর বিহা দিব,
যার ঘরের সনার ঝারি॥"

রেগ : "মহর পালে গাঁয়েই স্যাঘাব।
বরং চাল-খাসি ঘুরাঞ দিব॥"

পিছনে ফেলে-আসা ছেলেবেলার নানারঙের দিনগুলির কথা কেউ ভুলতে পারে না। বাল্যের সোণালী স্মৃতিবিজড়িত ক্ষণগুলিকে স্মরণ করে গেয়ে উঠে :

ধুয়া : "চল সরদা, চল বরদা, কুল্হিতে বাঁধ বাঁধাব।
কুলহির জলে সিনান করে, জরকায় চুল শুখাব॥"

রেগ : "কুল্হির ধূলা বাঁশ পাতের কুলা।
আমরা মেলেছি ছুটুর বেলা॥

টুসু গানে ভাসানের প্রধান স্থানগুলির পরিচয়ও মেলে। গানের মধ্যেই তা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :

"মনে করি 'পরকুল' যাব,
'পরকুল যাওয়া হ'ল না।
ই বছর ত এমন তেমন,
আর বছরকে মানব না॥"

রেগ : "শীলাই" গেলে কিলাঞ ঘুরাব।
তকে তিন ঘটি জল খাওয়াব ॥"

পুরুলিয়ার টুসু গানে রাজনৈতিকতার ছাপও এড়ায় নি। মানভূমের ৺অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক টুসু আন্দোলন তারই ফলশ্রুতি হলো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পুরুলিয়ার সংযুক্তি। গ্রামের মানুষ বিহার সরকারকে টুসু গানের মাধ্যমে জানিয়েছিল :

"শুন বিহারী ভাই!
তরা রাখতে লারবি ডাং দেখাঞ ॥"

পুরুলিয়ায় টুসু গান এখন ভোট প্রচারের প্রধান হাতিয়ার। টুসু গানের মাধ্যমে হাটে-বাজারে তাই শোনা গিয়েছিল :

'ভোট দিও না জড়া বলদে।
তরা পড়বি রে ভাই গলদে ॥' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

টুসু গানের সুর করে রামায়ণ-মহাভারতের কিছু কিছু অংশ গাওয়া হয়। নিরক্ষর সাধারণ মানুষেরাও রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ, সহজভাবে সম্যকরূপে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়।

যেমন : "রাম ন কি রে রাজা হবি, কাল ন কি তর অধিবাস?
চৌকাঠাতে লেখা আছে, চৌদ্দ বছর বনবাস ॥"
রেগ : "রাম কাঁদে বনে সীতাকে হ'রে লিল রাবণে ॥
অশোক বনে পাতের কুঁড়া, সীতা পাশা মেলেছে।"
যোগীর ভেসে রাবণ আ'সে সীতা হরণ করেছে ॥
সীতা হরণ করলি রাবণ রাখবি রে কেমন করে?
দেখবি রে তর সোণার লংকা দিব রে ডাহান ক'রে ॥"
'রাম কাঁদে বনে ... ॥'
"এক লক্ষ বেটা রাবণ শুয়া লক্ষ নাতিরে;
এক না রহিল রাবণ বংশে দিতে বাতিরে ॥"
='রাম কাঁদে বনে... ।'

টুসু জাগরণের সময় মেয়েদের কিছু বৈঠকি গান আছে যা তাদের একান্ত নিজস্ব। এই গানগুলি টুসু ক্লাসিক গান।

যথা : "আগান বাগান ফুলের বাগান,
সে বাগানে ফল ধরে।

রোদের সময় সে ফল খা'লে,
গা সুদ্ধা হেমাল করে ॥"

॥ রং ॥ "কে ডাকে বাগানে টুসু মা বলে ॥"

"রাজবালা গাঁথ মালা যতনে
টুসুর কারণে।
গাঁথ গাঁথ মালা সখী মনে
ফুলু বাগানে ॥"

জাগরণের রাত্রি শেষে একদল আর এক দলের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে যায়। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। একদলের চৌড়লের মালা অন্য দলের চৌড়লকে পরিয়ে দেয়। একে মালা বদল বলা হয়। মালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠে :

"লে-লে-লে মালা বদল কর;
আমরা আ'সেছি বেঙ্গলের দল ॥"

টুসু ভাসানোর জন্য পৃথক গান আছে। বিদায় মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসে ততই কথায় ও সুরে বিদায়ের মর্মভেদী করুণ রাগিনী বাজতে থাকে। হৃদয়ের সমস্ত সোহাগ দিয়ে টুসুকে তারা আঁচলে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু উপায় নেই। বুকে যত ব্যথাই বাজুক, যত কষ্টই হোক, বুকের শেল বুকে নিয়ে চোখের জল আড়াল করে যেমন মেয়েকে একান্ত পরিণতির জন্য মা মেয়েকে শশুর বাড়ী পাঠাবেই, তেমনি মকর এসে গেছে, আর মেয়েকে ঘরে ধরে রাখা যায় না। তাই প্রাণের শেষ আবেগটুকু নিয়ে গেয়েছে :

"তিরিশ দিন রাখিলাম মাকে,
তিরিশটি ফুল দিঞে গো।
আর রাখিতে লারব মাকে,
মকর অ'লে বাদি গো ॥"

বেগ : "টুসু ধমকে জলে দি-অ না, আমার—
বড মনের বেদনা ॥"

"জলে হেল জলে খেল,
জলে তোমার কে আছে ?
আপনার মনে বুঝে দেখ,
জলে শশুর ঘর আছে ॥"

রেগ ঃ "ছাড়ব না ধ'রে রা'খব আঁচলে,
কেমন করে যাবে টুসু, যাবে যমুনার জলে।
ছাড়ব না ধ'রে রা'খব আঁচলে ॥"

অবশেষে টুসু বিসর্জন হয়ে যায়। বিষাদক্লিষ্ট মনে বেলা শেষে আস্তে আস্তে সকলে বাড়ি ফিরে আসে।

রক্তরাঙা শিমুল-পলাশ পুরুলিয়ার বুক থেকে হারিয়ে যাবে? ভয় হয় পলাশ-শিমুলের মত উৎসব মুখর দিনগুলি হারিয়ে যাবে না তো? তা'হলে পুরুলিয়া কি নিয়ে বাঁচবে?

বাঁকুড়ার টুসু উৎসবের একদিক

তুলসী চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম সীমান্ত বাংলাব জনজীবনে বিশেষ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব টুসু উৎসব। বাঢেব মধ্যমণি বাঁকুড়ায় এই টুসুব অঢেল উৎসব এখানকাব লোকউৎসব ও সংস্কৃতিব ধারা কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই কৃষিমুখীন জেলাব আনন্দেব বহিঃপ্রকাশ ঘটে পৌষ মাসে এই টুসু উৎসবেব মধ্য দিযে। পৌষ পবব, মকব পরব, টুসু পরব, পিঠা পরব, টুসু ভাসান, গাঙ সিনান ইত্যাদি নানা নামে এই উৎসব চিহ্নিত। এই উপলক্ষে স্কুল কলেজ স্থানীয় ছুটি হিসাবে বন্ধ থাকে। এমন কি সবকারী অফিসও বন্ধ থাকে। বেসরকারী দোকান প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত আংশিক বন্ধ থাকে।

কার্তিক সংক্রান্তিতে মাটির খোলায় ধানগাছ, মানগাছ, দূর্বা, আখগাছ, হলুদগাছ, কলমীলতা, শুশনিলতা তাছাড়া কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, কাটাবি, চিড়েকুটুনি, সোনাব টুপি, রূপার টুপি, কাজললতা, ঘাসেব মামা, শিবের জটা ইত্যাদি লৌকিক নামধারী বিভিন্ন ঘাস, ঘাসফুল এবং পুকুরের পাঁক, কড়ি, গোটা সুপারি ইত্যাদি দিয়ে ইতু পাতা হয়। সারা অঘ্রাণ মাস ধরে চলে ইতু পূজা। এই ইতু হোল সূর্যপূজা। মনে হয় মিত্র > মিতু > ইতু—এইভাবে মিত্র অর্থাৎ সূর্য থেকে লোকমুখে ইতুতে পবিণত হয়েছে। ইতু অর্থাৎ ইতুর 'খলা' অঘ্রাণ মাসেব সংক্রান্তিব দিন ভোংবেলা উলুধ্বনি, শঙ্খ ও ঝাঁঝের ধ্বনি সহকাবে নিকটবর্তী জলাশযে ভাসান হয়। তাবপর সেই খোলা ঘরে এনে তাতে আবার শুরু হয় টুসুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ইতু খোলাব মতই বিবিধ গাছ ঘাস ধান কড়ি প্রভৃতি এবং নতুন ধানের তুষেব সঙ্গে গোবর মিশিয়ে তার থেকে তৈরি ছোট ছোট গোলাকাব নাড়ু দিয়ে সদ্যস্নাতা শুচিবস্ত্র পরিহিতা নারী টুসুর খলা সাজায়।

সারা পৌষমাস ধরে চলে টুসু পূজা। এই পূজায় ব্রাহ্মণেব এবং শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণেব প্রয়োজন হয় না। পৌষ মাসেব প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ির কুমারী মেয়েরা একসঙ্গে বসে টুসু গান করে। মুলা মুড়ি ইত্যাদি একান্ত ঘরোয়া খাদ্যেব নৈবেদ্য দেয়। ফুল দিয়ে টুসু খলা সাজান হয়। শীতকালে গাঁদা ফুলের প্রাচুর্য এবং এর স্থায়িত্ব ও রঙেব মনোহারিত্বের জন্য গাঁদা ফুলই টুসু ব্রতিনীদের বেশ প্রিয়। টুসুর গানে

কুমারী মেয়েদের সঙ্গে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেরা মা ঠাকুমা দিদিমা পর্যন্ত যোগ দেন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুলে দুলে বিচিত্র সুরে চলে স্বরচিত স্বতঃস্ফূর্ত, চির প্রচলিত একটানা গান। টুসুর নৈবেদ্য যেমন ঘরোয়া তেমনি টুসুর কাছে আসতেও সুচিবস্ত্র বা শুদ্ধাচারের প্রয়োজন হয় না। এখানেই টুসুর ব্রতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

টুসু আমাদের ঘরের বড় প্রিয়, বড় কাছের। তারই প্রকাশ টুসুর গানে ও ছড়ায়। প্রথমেই শুরু হয়—উঠ উঠ উঠ টুসু / উঠ করাতে এসেছি। তুমারি সব সঙ্গতি আমরা / টুসু পূজাতে বসেছি।

ইচ্ছেমত এলোমেলো গান গেয়ে চলে ব্রতিনীরা টুসু 'উঠানের' গানও যে প্রতিদিন গাইতে হবে এমন নিয়ম নেই। প্রাণের মনের আবেদন আবেগ ইচ্ছা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এই সব গানের মধ্য দিয়ে।

বাড়ি-ধারে নারকল গাছটি বারে বারে সাজাব / একটি নারকল ফেটে পড়লে ডাকে চিঠি পাঠাব। ...ইত্যাদি।

টুসু যেন আমাদের বাড়ির কন্যা। বৎসরান্তে আসে, আবার নির্দিষ্ট সময়ে তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতেই হয়। তাই কন্যাকে কেন্দ্র করে চিরন্তন নারী মনের গোপন মনস্তত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে টুসু গানের মধ্য দিয়ে। এই সব গানে ধরা পড়েছে সমাজ-সংসার-পারিপার্শ্বিকতা। এমন কি বাঙালি ঘরের ছোট খাট জ্বালা-যন্ত্রণা ঈর্ষা, ব্যথা, আনন্দ-বেদনার প্রতিটি স্পন্দন। টুসুকে উপলক্ষ করে অশিক্ষিত গৃহবন্দী সলজ্জ নারীর জীবনবেদ প্রকাশিত হয়। জীবনের গানে টুসু জীবন্ত। তাছাড়াও টুসুগানে সমাজনীতি-রাজনীতিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে গল্পে শোনা কত অজানা দেশের প্রতি বিস্ময়, ভয় আর আকাঙ্ক্ষার আকুতি। শোনা যায় এক সময় সিংভূম ও মালভূমে বাঙালিদের স্বার্থহানিমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ভীষণভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছিল এই টুসু গানের মধ্যে দিয়ে। এবং বিহার সরকার টুসু গানের প্রচলন বন্ধের জন্য নাকি অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

সারা পৌষমাস ধরে ভালোবাসায় যত্নে আশায় আকাঙ্ক্ষায় টুসুকে ভরিয়ে তোলার পরে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসে। তাই পৌষ সংক্রান্তির আগের তিনদিন অর্থাৎ টুসু ভাসানের তিনদিন আগে থেকে শুরু হয় বিদায়ী গানের জোয়ার। বাঙালি সমাজের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাতেই হবে তাতে যতই বিদীর্ণ হোক না মাতৃহৃদয়। তাই অন্তর মথিত বেদনায় গেয়ে ওঠে : ত্রিশ দিন রাখলাম মাকে/তিরিশ সল্‌তা দিয়ে গো/আর রাখিতে লারলম মাকে / মকর আইচেন

লিতে গো/নিরুপায়ভাবে শেষ কামনাও ফুটে ওঠেছে গানে গানে, আইচেন মকর বেশ করেচেন/টুসু রাখবেন যতনে/আমরা আবার আনতে যাব/পৌষ মাসের প্রথম দিনে।' মনে করিয়ে দেয় আগামী বিজয়ার মাতৃহৃদয়ের করুণ আর্তির কথা।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বাউরী। বাড়ি বাড়ি গান আর পিঠে গড়ার ধুম। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের নিপুণ ও নিখুঁত ভিড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন গৃহিনীরা। বংশানুক্রমিক নিয়মে বাউরী বাঁধা হয়। বাঁকুড়া জেলায় পৌষসংক্রান্তির আগের তিন দিন যথাক্রমে আউড়ী-চাউড়ী-বাউড়ী নামে অভিহিত। আওনি, চাওনি বাউনি বোধ হয় লোকমুখে আউড়ী চাউড়ী বাউড়ীতে পরিণত হয়েছে। ছড়া বাঁধা হয়েছে : আউড়ী চাউড়ী বাউড়ী/তিনদিন তিনরাত কোথাও না যেও/ঘরে বসে পিঠে ভাত খেও।

এই তিনদিন ঘরে লক্ষ্মীকে আনা স্থাপন করা ও বন্ধন করার ইঙ্গিত দেখা যায়। আওনি বা আউড়ী অর্থে মা লক্ষ্মীর আগমন। চাওনি বা চাওড়ী মায়ের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা ও বাওনি বা বাওড়ীতে বন্ধন অর্থাৎ মাকে গৃহে বেঁধে রাখার অদ্ভুত বিশ্বাসেই সব লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য লক্ষ্মীলাভ ও পরমানন্দে আত্মীয় পরিজনবেষ্টিতাবস্থায় আহার উৎসবে দিন কাটান।

বাড়ীর গৃহিনীরা রাতের রান্না খাওয়া শেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ধোয়া কাপড়ে বাউড়ী বাঁধে। উনবিংশ শতাব্দীর কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষ পার্বণ' কবিতার মধ্যেও এই বাউনি বা বাউড়ী বাঁধার উল্লেখ দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় এই বাউড়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নিয়মে বাঁধে।

যেমন — শুঁড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'লইতুন লা' দিয়ে বাউরী বাঁধায় নিয়ম, হাঁটুর ওপর খড় রেখে নিচের থেকে ২২ পাক দিয়ে সেই পাকানো খড় বা 'লইতুন লা দিয়ে লক্ষ্মীর যাবতীয় ভাণ্ডার হাঁড়ি বাক্স ইত্যাদি বাঁধা হয়।

ময়রা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ৫ রকম ডাল, ৪ রকম আনাজ সহযোগে খিচুড়ি রান্নার রীতি আছে। তিল, নারকেল, চাঁছি, কলাই—এই চার রকম পুর দিয়ে তৈরি পাঁচটি সেদ্ধ পিঠাও বাউরী বাঁধার অপরিহার্য উপাদান। তিনদিন পর ২ রা মাঘ এইগুলি সব জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। খড় দিয়ে বাঁধা অবশ্যকরণীয়। এই দিন এরা সকলেই নিরামিষ ভোজন করেন।

কর্মকার সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪ রকম পুরে ভরা সেদ্ধ পিঠায় বাউরী বাঁধতে দেখলাম। পরে সেই নির্দিষ্ট পিঠাটি জলে ফেলে দেওয়া বা 'জলাশয়' করা হয়। বাক্স হাঁড়ি ইত্যাদিতে খড় বাঁধার অনুরূপ নিয়ম বর্তমান।

ছুতারদের বাউরী বাঁধার মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে ওরা পুনিহাঁড়িতে অর্থাৎ যে হাঁড়িতে পিঠা সেদ্ধ করা হয় তাতে বাউরী বাঁধে আর সেই হাঁড়ি যখন শেষ বারের মত উনুন থেকে নামায় তখন তাতে সামান্য চাল দিয়ে নামায়। কারণ শুধু গরমজলের হাঁড়ি নামানো নাকি অকল্যাণ। আর তারা ভর্তি চালের হাঁড়িতে বাউরী বাঁধে। ভর্তি হাঁড়ির অভাবে ছোট একটা পাত্রে জল পূর্ণ করে তাতেও বাউরী বাঁধে।

বাগ্দী সম্প্রদায় হাঁড়ির চারদিকে গোবর জল ছিটিয়ে বাউরী বাঁধে। লোহার সম্প্রদায়ের বাউরী বাঁধার মধ্যে তাদের উচু নিচু, 'থাক' বা বিভাগ অনুযায়ী বাঁধাব নিয়ম। বাচ্চা হবার পর যাদের ৫ দিনে অশৌচ যায় তারা পাঁচটি বাউরী বাঁধে। যাদের ৯ দিনে অশৌচ যায় তারা ৯টি বাউরী বাঁধে। ৯ দিনের অশৌচান্ত ঘর বড ঘর বলে দাবি করে। খড়কে উল্টো দিকে পাকিয়ে ঐ ভাবে ৫/৯ ইত্যাদি বিধিমত বাঁধা হয়। ডোম সমম্প্রদায়ের মধ্যে এই দিন মৃতের প্রতি সম্মান জানানো হয়। তিনটে পিঠে শালপাতায় মুড়ে উনুনে পুড়িয়ে সেই পিঠের উপর তুলসী পাতা রেখে চারদিকে জলের ধারা দিয়ে মৃত পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। তারপব বাড়ির সকলে পিঠা খায়।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধিনিষেধের বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়। একই সম্প্রদায়ের নিয়মও বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে দেখা যায়। আবার কারো কারো নিয়ম আছে প্রথম পিঠে তৈরি করে একটি গোমুখে একটি জলাশয়ে জলচর জীবদের জন্য একটা বাড়ীর চালে খেচর প্রাণীদের উদ্দেশে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বাউরী বাঁধা, পিঠের হাঁড়ি, বাক্স আলমারী চালের হাঁড়ি ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসে নতুন খড দিয়ে জড়িয়ে রাখাকে বলা হয়। পরের দিন ঐ সব খড জলে ভাসিয়ে দিতে হয়।

এই দিনই কারো কারো রাতে পায়ে তেল মেখে শোবার নিয়ম। নইলে নাকি ভূতের আক্রমণ হয়। এর পেছনে মনে হয়, মকর সংক্রান্তির প্রাতঃস্নানের পূর্ব প্রস্তুতিই বর্তমান। যাতে ঠাণ্ডা-ভূত কাবু করতে না পারে।

একদিকে বিধি-নিষেধ আর আবরণের ঠাস বুনন অন্যদিকে টুসুকে নিয়ে গানে গানে উচ্ছল হয়ে ওঠে গ্রাম। রাত্রি বেলায় নানা ধরনের গান গেয়ে দলবেঁধে কুমারী মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় 'বুলে বেড়ায়', একে টুসুর 'বুলানী' বলা হয়। শোলা, বাঁশের কঞ্চি, রঙিন কাগজের তৈরি ৭।৯।৫ ইত্যাদি চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরাকৃতি ভেলা বা চৌদলের ভেতর চারদিকে বৃত্তাকারে প্রদীপ সাজানো মাটির টুসুখলা ফুলে ফুলে

সাজিয়ে ব্রতিনীরা ভোর বেলায় বড বড জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হয়। টুসুর খলা দুতলা তিনতলাও হয়ে থাকে। সেখানেও বিদায়ী মূর্চ্ছনার সঙ্গে অন্যদলের টুসুকে নিয়ে ব্যঙ্গ রসিকতার ঢেউ—

'আমার টুসু মুড়ি ভাজে। চুড়ি ঝলমল করে গো। উয়ায় টুসু হ্যাংলা মাগী। আঁচল পেতে মাগে গো। ইত্যাদি……।' পৌষ মাসকে চিরদিনের জন্য আমন্ত্রণ ঃ

'পৌষ মাসের পৌষালি / ধান কা বাসের ঘর করি / এস পৌষ যেয়ো না / জনম জনম ছেড়ো না /'

টুসুকে বিদায় দিতে হবে কিন্তু মান আর ভাঙে না ঃ

'চার কোণে চার পুকুরটি মা / লগম লতায় ঘিরেছে / মনের কপাট খোল টুসু / তোমার প্রাণনাথ এসেছে / চারধাবে চার সরস্বতী / মান ভাঙ্গাতে বসেছে/'

এই দিনই টুসু ভাসিয়ে স্নান কবে অনেকে সইপাতায় / তার গানও ঝংকৃত হয়ে ওঠে ঃ আচিরে প্রাচীরে পদ্ম / পদ্ম বই আর ফোটে না / টুসুর হাতে জোড়া পদ্ম / ভ্রমরা বই আব বসে না / ভ্রমব এল যাতা যাতা / রসিক দেখে সই পাতা / গানের ছড়াছড়ি। নিরক্ষরও যে সাহিত্য সৃষ্টির অংশীদার হতে পারে এবং তা যথেষ্ট সমাদরনীয় হয়ে উঠতে পাবে তার নিদর্শন টুসু সংগীত। শত অভাবেও এব স্রোত বয়ে চলেছে ঈর্ষণীয় গতিতে।

মকর সংক্রান্তি দিন স্নানের ঘাটে প্রচণ্ড ভিড। একদিকে ব্রতিনী অন্যদিকে পুণ্যার্থী ও দর্শক। স্থানীয় ছেলেরা বেশ কিছু দিন ধরে সংগ্রহ করা বাঁশ কাঠ খড দিয়ে পুকুর পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ তৈরি করে। ভোরবেলা তাতে অগ্নিসংযোগ কবা হয়। একে বলে 'ম্যাডা ঘর' কোথাও একে 'কুঁয়ো'ও বলে থাকে। এইদিন নতুন কাপড পরাও উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। স্নান করে নতুন কাপড পবে স্নানার্থীরা 'কুঁয়ো'র আগুনে নিজেদের তাতিয়ে নেয়, এই পুণ্য স্নান ব্রাহ্মণ থেকে বাউরী পর্যন্ত সকলের জন্য। রাণীবাঁধ থানার গভীর জঙ্গলের মানুষ 'খেড়িয়া'রা পর্যন্ত এই দিন প্রাতঃস্নান করে। এই স্নানকে কেন্দ্র করে ওদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া ঃ 'মকর না থকর আলেক। যত খেড্যার মরণ আলেক।'

টুসু বিসর্জন উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। যেখানেই নদী বা বড জলাশয়, ধরে নেওয়া যায় সেখানেই টুসু ভাসানের উৎসব এবং জমজমাট মেলা। এইসব মেলার স্থায়িত্ব ১ দিন কিংবা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

বাঁকুড়া জেলার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত টুসু মেলা পোরকুলের মেলা। বাঁকুড়া

থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে খাতড়া থানার কংসাবতী নদীর কোলে বসে এই মেলা। এই মেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোক সমাগম হয়। বেলা যত বাড়তে থাকে টুসু খলা, টুসু মূর্তি মাথায় নিয়ে দলে দলে নারী পুরুষের ভিড় জমে ওঠে। এখানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য টুসু মূর্তি এবং পুরুষদের টুসু প্রতিমা নিয়ে মাদল ধামসা, করতাল সহযোগে গান ও লাঠি, টাঙি, বল্লম নিয়ে গানের তালে তালে উন্মাদ নৃত্যের দৃশ্য। এখানে বিভিন্ন ভঙ্গির টুসু মূর্তি দেখা যায়। যেমন ঘোড়া বাহিনী, ময়ুর বাহিনী, এবং একই মেড়ে ময়ুর বাহিনী দুই টুসু মূর্তি। টুসু মূর্তির গায়ের রঙ হলুদে। একহাতে পদ্ম অন্য হাতে শঙ্খ। আর কোন মূর্তির বাম হাত পাতা, ডান হাতে অভয় মুদ্রা। পরিধানে নীল শাড়ী। ছোট পুতুলের মত মূর্তিও আছে। নানা ধরনের টুসু গান। প্রেম, দেহতত্ত্ব, ব্যঙ্গরসিকতা কিছুই বাদ যায়নি। আবার স্থানের নামোল্লেখ করে গান হয়েছে।

◦ পরকুল দহে ফুল ফুটেছে / কেউ তুলিতে লাড়েছে / আমার টুসুর এমনি ছাতি / জোড়া লৌকা ছেড়েছে।

◦ পোরকুল দহের হুদহুদানি। পুঁটি মাছের উজানি / কি মোহিনী দিলে টুসু / লোক আসিছে আপনি।

মেলায় মিষ্টি থেকে সব্‌জী পর্যন্ত কেনাবেচা চলছে। শিবের মন্দিরে পূজার ভিড। স্নান করে সবাই বড করে কাপড় বিছানো জায়গায় সাধ্যমত চাল পয়সা দিয়ে স্নানের দানের পুণ্য অর্জন করে বেলাশেষে বাডি ফিরে যায়।

সমস্ত মেলা ঘুরলে গ্রামের মধ্যে চোখ মেলে তাকালে কতনা বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। যেমন দক্ষিণ বাঁকুডার অঞ্চলগুলিতে টুসু উৎসবের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

◦ এই অঞ্চলে টুসু মূর্তি বর্তমান। যা অন্যত্র প্রায় নেই।

◦ এখানে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে লাঠি, টাঙ্গি ইত্যাদি সহযোগে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে টুসু বিসর্জনের রীতি বর্তমান।

◦ বিসর্জনের সময় কাড়া-নাকড়া, কাঁসর, জয়ঢাক, ধামসা প্রভৃতি বাদ্য বাজান হয়।

◦ পুরুষেরাও মেয়েদের মত সমভাবে উৎসবের আনন্দে যোগ দেয়, কিন্তু যেখানে উচ্চবর্ণ হিন্দু, নিম্ন বর্ণহিন্দু, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত মিলেমিশে রয়েছে সেখানে—

◦ মহিলা এবং কুমারী মেয়েরা দলবদ্ধভাবে গান করতে করতে টুসু ভাসায়।

◦ টুসু মূর্তির পরিবর্তে টুসু খলা ডোলা বা চৌদল দেখা যায়।

◦ শোভাযাত্রায় পুরুষের স্থান নেই।

◦ এদের মধ্যে চাঞ্চল্য বর্তমান কিন্তু উদ্দামতা নেই।

টুসু গান লোক সংস্কারের এক পরম মূল্যবান সম্পদ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এই সম্পদ অবলুপ্তির পথে। শিক্ষিত জনসমাজের বদান্যতা ও নবমূল্যায়নের উপরে নির্ভর করছে এর ভবিষ্যৎ।

আঞ্চলিক টুসু সমীক্ষা ঃ মেদিনীপুর

নিবেদিতা ভৌমিক

টুসু লোকোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-অনুষ্ঠান মানুষকে দুঃখ, গ্লানি ও শত্রুতা ভুলিয়ে দেয়। টুসুতেও কোন ব্যতিক্রম হয় না। টুসুও উৎসবের দিনে সবার কাছে অগাধ স্বাধীনতা তুলে দেয়। টুসু কর্মবিরতি এবং আমোদের উৎসব। সারাবছর অন্নের জন্য সবাইকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু এই দিনটি সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

সংসারের বেশির ভাগ দায়িত্ব, ঝামেলা ও দারিদ্র্যের বোঝা মেয়েদেরই বইতে হয়। মেয়েরা আমোদের ফুরসৎ এবং সুযোগ খুব কমই পায়। সেজন্য টুসু উৎসব মেয়েদের আমোদ-প্রমোদের জন্যই মূলত অনুষ্ঠিত হয়।

টুসু উৎসব প্রধানত তিনদিনের। সারাবছর যেমনই হোক এই কদিন এরা সবাই ভালো ভালো খাবার খায়। বিশেষত পূজোর দিন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাবার প্রত্যেক বাড়িতেই হয়। পিঠে হওয়া নিয়মের মধ্যে পড়ে।

টুসু উৎসবের উদ্দেশ্য, পূজোর উপকরণ, মন্ত্র, পূজোর নিয়ম ইত্যাদি মেদিনীপুর জেলার মহাতাপপুর গ্রামের কংসাবতী নদীর তীরে বলিখাদান নামক একটি জায়গায় ভূমিজ, মূল্যক্ষত্রিয় এবং মাহাতো এই তিন সম্প্রদায়ের সমীক্ষা করে যা কিছু পেয়েছি সেগুলো নিচে এক এক করে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি।

পূজোর নিয়ম পদ্ধতি প্রায় এই তিনশ্রেণীরই এক। অল্প তফাৎ। পূজোর দুদিন থেকে আট দিন আগে এঁরা টুসু কিনে আনেন। মূল্যক্ষত্রিয়রা যেদিনই টুসু কিনে আনেন সেদিন থেকেই সকাল সন্ধ্যে যাঁদের বাড়ীতে টুসু রাখা হয় তাঁদের কর্তা পূজো করেন অর্থাৎ জল আর ফুল দেন। কিন্তু আসল পূজো পৌষসংক্রান্তির আগের দিন হয়। এদিন সবাই সবকিছু খেতে পারে। এমনকি পূজারীরাও আমিষ খেয়ে পূজো করেন। টুসু পূজা রাত্রি দশটা এগারটা নাগাদ হয়। অনেকে মিলে একসাথে টুসু কিনে কোন একজনের বাড়িতে রেখে পূজো করেন। সে বাড়ীর বয়স্কা মহিলা টুসুর মা এবং ওনার স্বামী টুসুর বাবা হন।

টুসুকে যেখানে বসানো হয় সেই জায়গাটা গোবর জল দিয়ে নেতা দিয়ে নেওয়া

হয়। তারপর আলপনা কেটে ধান ছড়িয়ে টুসু বসানো হয়। টুসুর কোন মন্ত্র নেই। গান গেয়ে টুসু পুজো করা হয়। টুসুকে গাঁদা ও আকন্দ ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। টুসুকে সিঁদুর পরানো হয়। আতপচাল বা চিঁড়ে, গুড়, লালাসু, শাখালু, আখ, মটরশুঁটি ইত্যাদিকে কাঁচা মেখে এক রকম ভোগ করা হয়। ঐ ভোগই হয় টুসুর প্রসাদ। কিন্তু সেদিন সে "ভোগ প্রসাদে" হাত দেওয়া হয় না। সবাই টুসুর কাছে বসে গান গেয়ে গল্প করে রাত জাগে।

পরের দিন টুসু ভাসানো হয়। বেলা বারটার মধ্যে টুসু ভাসাতে বেরিয়ে পড়তে হয়। টুসু ভাসানো পর্যন্ত না খেয়ে থাকে। টুসুকে খই ছড়াতে ছড়াতে ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যায়। পুকুরে টুসুর সাথে সবাই ডোবে। টুসুর মা বাবা ডুবিয়ে "ডুলখেলা" খেলে। পুকুর ঘাটে বিভিন্ন দলের মধ্যে রসিকতা করে। কোন কোন সময় গানের লড়াই হয়। যেমন—

"নদীর টাকি তোর বাপের বটে
মোরা নাইব লো সবাই মিলে"।

টুসু ভাসিয়ে উঠে সবাই নতুন কাপড় পরে এবং বাড়ি ফিরে বাসী পিঠে খায়।

আমার সমীক্ষায় এই তিন সম্প্রদায়ের পূজোতে যেটুকু পার্থক্য পেয়েছি সেগুলি নিচে পরিবেশন করছি।

১। মহাতাপপুর গ্রামের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকালয়ের মধ্যে দুজন ভূমিজ কুলবধূ। এনাদের শ্বশুর বাড়িতে এই পূজো হয় না। তাই বাবার বাড়িতে গিয়ে এই পূজো করেন। এনারা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টুসু নিয়ে একসাথে কোন একজনের বাড়িতে পূজো করেন।

৩। মহাতাপপুর গ্রামের বালিখাদান অঞ্চলে মূল্যক্ষত্রিয়দের প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি পরিবারের কুড়ি পঁচিশজন মিলে একটি টুসু কিনে পূজো করেন। এঁদের টুসুর বাবা ও মা মেয়েরাই হন। এঁরা থালার উপর চাল দিয়ে টুসু বসান। এঁরা পূজোতে দূর্বাঘাস দেন। খই ছড়িয়ে টুসু নিয়ে যাওয়ার কোন নিয়মই নেই। তবে মাঝে মাঝে এঁনারাও খই ছড়ান। ছেলে মেয়ে উভয়ই টুসু পূজো করেন। এরা হোলেন—

বাসন্তী নায়েক	পূর্ণিমা নায়েক
মরীলা নায়েক	রেণু নায়েক
বিমলী নায়েক	অন্দুলী নায়েক

চড়বুড়ি নায়েক	সুরবুড়ি নায়েক
ভবানী নায়েক	বৃন্দে কপাট
রানী কপাট	তলমলী কপাট
রবি নায়েক	বংশী নায়েক
তপন নায়েক	

এঁারা প্রায় আঠার কুড়ি বছর আগে বাংলা বিহার ও ওড়িশার প্রান্তদেশ থেকে এসেছেন।

৩। এই বালিথাদান অঞ্চলের এক ভূমিজ পরিবারের পাচ বোন এক সাথে পূজো করেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে: রীতা সিংহ, গীতা নায়েক, মন্দিরা সিংহ, বেণু সিংহ, সীতা নায়েক। এঁদের বড়দির বাড়িতে পূজো হয়। উনি মা এবং ওনার স্বামী বাবা হন। কিন্তু টুসুর মা সারাদিন নির্জলা উপোসে থাকেন। এঁরা রাত্তিরে পূজো করে পিঠে, মাছ, মাংস ইত্যাদি খান।

দেবদেবীর আরাধনার পশ্চাতে হয় কোন অমঙ্গল আশঙ্কা অথবা বাসনা পূর্তির ইঙ্গিত থাকে। আমার এই সমীক্ষা থেকে জানলাম যে ওনারা কোনো চাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্য না নিয়ে এই পূজা করেন। কেবল আনন্দ পাওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। এই গ্রামের কোন তথাকথিত উঁচু জাতি এই পূজো করেন না। এই সম্প্রদায় হচ্ছেন দিন মজুর। স্বামী স্ত্রী উভয়েই কাজ করেন। তাই বিলাসিতার প্রশ্নই আসেনা। আর্থিক প্রতিযোগিতা এঁদের মধ্যে নেই বলেই অন্যান্য উৎসব থেকে সরে এসে এই নিঃস্বার্থ উৎসবটি ওরা পালন করেন। ওনারা অল্পে সন্তুষ্ট তাই সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প খরচে টুসুকেই বিনা-ক্ষোভে তৃপ্তিভরে পূজো করে আনন্দ পান।

যদিও টুসুর দু একটা গান শুনলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে কিছু বুঝি ওরা চাইছেন কিন্তু আমার মনে হয় ওগুলি নিছক গান। গাইবার জন্যই ওনারা গান, কিছু উদ্দেশ্য এবং পাওয়ার তাড়নায় গান না। যেমন—

কাপড় দেবার কথা ছিল
পাঁচ ফুলম শাড়ী
হাতে নেইকো পয়সা আমার
মিছাই মনকে জগালি
গত ফাগুন মাসে
বড় মজা পেয়েছিল আইন পাশে

হোক না আমার কানা ঘোড়া
যেমন না হয় গাল তোবড়া
ছ' বছরের শিশু ছেলে
দিললো সিঁদুর ঘষে
গত ফাগুন মাসে
বড় মজা গেছে লো গত ফাগুন মাসে
আইন পাশে।

এই গানটি শুনলে অনেক সময় মনে হয় যে উপযুক্ত স্বামী পাবার আকাঙ্ক্ষাতেই বুঝি এই পূজো করছেন, কিন্তু ঠিক তা নয়—এই গানের মধ্য দিয়ে ওদের মনের প্রতিফলনই প্রকাশিত হয়েছে। ওরা যা চান না অথচ পেলে খুশী হন তাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সবাই একত্রে মিলে মিশে আনন্দ স্ফূর্তি করতে যে ভালবাসেন তার পরিচয়ও এখানে স্পষ্ট।

১ মকব ডুবে নদীর কিনারে
তোরা আসবি সবাই মিলে
শাঁখা শাড়ি, রেশমী চুড়ি
পরবোরে সবাই মিলে
মকর ডুবে নদীর কিনারে ॥

২ রাম নাকি রে বনে যাবি
বললি না মনের কথা
চোদ্দ বছর বনে যাবিরে
চাইলরে মনের প্রাণ ॥

৩ কিবা টুসুর আটাবাটা
কিবা টুসুর গালফাটা
কুন কারিগর গড়েছিল
সে যে বড় লম্পটা ॥

৪ ছোটবনের লতাপাতা
বড় বনের শালপাতা
কোন্ বনে হারালে টুসু
সোনা বাঁধা লালছাতা
মাছ কুট্‌লুম চাকা চাকা
মাছের কাঁটা সিজেনি
বুড়া হয়ে তপড়ে যাবে
তোমার পরানে চাইবেনি ॥

তুষালুব্রত ঃ রাঢ় সীমান্ত অঞ্চল

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, সাহিত্য বিনোদ,

গ্রামময় রাঢ় বাংলার গ্রামে গ্রামে 'বারমাসে তের পার্বন।' এদেশের মেয়েরা নানা তিথিতে নানা ব্রত উদযাপন করে। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে, শীতে বসন্তে উদযাপিত হয় নানা ব্রত। এদেশের মেয়েরা এইসব ব্রত কেন উদযাপন করে? এইসব ব্রতের ধারা কতদিনের? উৎস কি? এসব আমরা চিন্তা করেছি বলে মনে হয়না। আমার মনে হয় এগুলি নিয়ে গভীরভাবে অনুধাবন ও অনুসন্ধান করলে বাংলার জনসমাজ তথা সামাজিক বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাবে। বাংলার বিভিন্ন ব্রতগুলির মধ্যে তুষালু বা তুষলা অন্যতম। এই প্রবন্ধে তুষালু ব্রত সম্পর্কে কিছু আলোচনার চেষ্টা করা হলো।

"তুষালু" উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমান্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক নাম। মূল নাম "তুষলা।" কৃষিপ্রধান বাংলার রাঢ় অঞ্চলে ঢেঁকির সাহায্যে ধানের চাল করা হয়। ঢেঁকির সাহায্যে প্রথম পর্যায়ে ধান ভানার সময় ধানের গা হতে বড়বড় খোসা বেরিয়ে আসে। কুলোর দ্বারা নিপুণ প্রথায় খোসা ও চাল আলাদা করা হয়। প্রথম পর্যায়ের খোসার নাম "তুষ"। পরবর্তী পর্যায়ের সূক্ষ্ম খোসার নাম কুঁড়ো। রাঢ়ের কুমারী মেয়েরা এয়োতি বা ইতু পূজা শেষ করে সেই পাত্রে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ধানের তুষ দিয়ে টুসু পাতে। তারপর পৌষ সংক্রান্তির দিন এই পাত্রটি ভেলার আকারে সাজিয়ে নিকটস্থ নদী, জলাশয় প্রভৃতিতে ভাসিয়ে দেয়। তুষ+লা অর্থাৎ তুষের নৌকা তাই নাম তুষু বা টুসু। এইভাবে টুসু নামে উৎপত্তি।

[উদযাপনের কারণ] রাঢ়ের কুমারী মেয়েরা ভায়ের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত উদযাপন করে থাকেন। এই ব্রত পর পর চার বৎসর উদযাপন করতে হয়। লোকবিশ্বাস যে এই ব্রত উদযাপন করলে ভায়েরা সবপ্রকার বিপদ আপদ হতে মুক্ত থাকে।

[ব্রতের উপকরণ] একটি মাটি ছাপা (পাত্র বিশেষ), অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত নবান্ন ধানের-লঘুধানের-তুষ বা কুঁড়ো, দাঁত উঠে নাই এমন গোবৎসের গোবর, কুচ ফল, লঘুচালের গুড়ো, সিঁন্দুর, চন্দন, কাজল, মাটির প্রদীপ, হলুদ মাখানো এক

টুকরো কাপড। প্রথমে চালের গুড়োতে একটু জল মাখিয়ে ছাপাটিতে মাখন হয়। তারপর দিতে হয় নবান্নের কুড়ো। কুড়োর উপর গোবরের সঙ্গে কুচফল মাখিয়ে নয়টি গুটুলি পাকিয়ে দিতে হয়। সেই গুটুলি নয়টির উপর ছিটিয়ে দিতে হয় কুচফল, হলুদ মাখান কাপডটির উপর সিঁদুর, চন্দন ও কাজল এঁকে দিতে হয়। তারপর ঐ কাপড দিয়ে ছাপাটি ঢেকে দেওয়া হয়। প্রজ্বলিত প্রদীপটি কাপড়ের উপর রাখা হয়। কাপড়ের ঢাকা খুলে নৈবেদ্য সাজিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিন পূজা করতে হয়। পূজা শেষ হলে কাপড ঢাকা দিয়ে তার উপর প্রজ্বলিত প্রদীপ রেখে সংক্রান্তির রাতটা জাগতে হয়। এই রাত্রে তুষালুকে কেন্দ্র করে মেয়েরা নানারকম ছড়া আবৃত্তি করে। অতঃপর ভোরে তুষালু ভাসিয়ে দিয়ে স্নান সেরে ঘরে ফিরে আসে।

[তুষালুব ছড়া] কুডো বা তুষ সংগ্রহের ছড়া ঃ

নবান্নের ধান ভাণ্ডি দিনক্ষণ করে,
তার চারটি কুডো রাখি তুষালু মায়ের তরে।
তুষালু গো রাই, তুষালু গো রাই
তুষ্, তুষ্, তুষ্, তুষালু, তুষালু গো রাই
তোমার দৌলতে মোরা ছব্বরি পিটে খাই,
চব্বরি, নব্বরি গাঙ্গ সেন্নানে যায়।
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাডি মকরের জল খায়
চার মাস বর্ষা বউ কন্যাদানে,
হাতে পো কাখে পো
পৃথিবীটা জুডিয়ে গেল
না পডলো রে।
শঙ্করকে সাজায় রে ভাই গৌরীকে দান।
সংক্রান্তির দিনের ভাই তুষালু মায়ের নাম।

তুষালুকে খাওনোর ছডা ঃ—

রোদ উঠেছে, রোদ উঠেছে টুয়ে।
আমাদের এই বত্রিশ গাই দুয়ে।
বত্রিশ গাই-এর ঘি কলসী,
সরু চালের ভাত।
মুজে মুজে খাও তুষালু সেই পৌষ মাস।

তুষালুকে সাজানোর ছড়া ঃ—

চাল গোটাচার রাম সজনী
ভাত গোটাচার খায়,
টাকার পুঁটুলি নিয়ে সজনী
সেকড়া পাড়া যায়।
সেকড়া ভায়া, সেকড়া ভায়া
বাড়ীতে আছ হে,
আমার তুষালুর বিয়ে হবে
গয়না চাই হে।
গহনাতো দিলেরে ভাই
অনেক যতনে,
হাত বালা না দিলে
সাজাব কেমনে।
হাতের বালা দিলেবে ভাই
অনেক যতনে,
গলাব হাব না দিলে
সাজাব কেমনে।
গলার হার দিলেতো ভাই
অনেক যতনে
হাতের বাজু না দিলে ভাই
সাজাব কেমনে।
হাতের বাজু দিলে তো ভাই
অনেক যতনে।
নাকের নথ না দিলে
সাজাব কেমনে।
নাকের নথ দিলে তো ভাই।
অনেক যতনে,
মলখাড়ু না দিলে
সাজাব কেমনে
জাম গুড়াগুড় বাজনা বাজে
জামতরিয়া ঘাটে,

এই রকম আর একটি গান :

লাল উঠেছে, নীল উঠেছে বড গঙ্গার ঘাটে।
কার আছে গো পইতা জোড়া দাও গো লালের হাতে
লাল উঠেছে নীল উঠেছে মেজ গঙ্গাব ঘাটে,
কার আছে গো ধুতি জোড়া দাও গো লালের হাতে।
লাল উঠেছে নীল উঠেছে ছোট গঙ্গার ঘাটে,
কার আছে গো লাল গামছা দাও গো লালের হাতে।

নালাই নালাই জল যায় ডুবে মরি গো,
ঝাঁপির কাপড বার করে দাও দক্ষিণ যাব গো।
দক্ষিণের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে
খাটো খাটো চুলগুলি সব নোটন বেঁধেছে
নোটনকে তো সাজে না ভাই নীল মানিকে,
সাজে নীলমণির বিয়েতে, রাঙ্গা লাটু বাজে
রাঙ্গা লাটুটি ঠকঠকাটি দাদা কোথায় গেল
হালের গরু পালে দিয়ে বৌ আনতে গেল।
ঐ যে দুইটি বৌ আসছে আমাদের বটে,
দাদা খেল পান খিলিটি, বৌ মল লাজে।

কালো বীর কালো বীর বিজয়া গমন।
বামুন পাড়াতে গিয়ে দিল দরশন ॥
বামুনদের একে একে খেলে ধরিয়ে।
বামুনদের পইতা জোড়া রইল পড়িয়ে ॥
বেনু দাদার চালেরে চাই পাকা কিতুরী
বেনুদাদার বৌ এসেছে অতি সুন্দরী।
অতিহোগ পতিহোগ সব সইতে পারি,
নাক তুলে কথা বলে ঐ জলনে মরি।

তুষলা ভাসানোর সময় অন্যান্য তুষলা সম্পর্কে :

কিবা কুলো কুলো
উহাদের তুষুটার পেটটা কেন কুলোগো
পেটটা কেন ফুলো।

কিবা স্থপ স্থপ

গোয়ালাদের তুষুটা ছাচ কোলে পুত
কিবা ঢেঁনি ঢেঁকি
জেলেদের তুষুটা
পেটটা কেন মেকি।

তুষলার বিদায়কালীন গান :

তিরিশ দিন রাখলাম মাকে
তিরিশ সলতে জ্বালিয়ে গো।
আর তুষালু থাকবে না
মকর এসেছেন নিতে গো॥

তুষালুব্রতের বিববণী দেওয়া হলো। এই ব্রতের বিবরণী অনুধাবন করলে প্রাক্ ইতিহাস যুগের রাঢ বাংলার কৃষি নির্ভর ও পশুপালন সমাজ জীবনের খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। একদা রাঢ়ের মানুষেব পূর্ব পুরুষেরা ধীরে ধীরে পাহাড়ী ও পাথুরে জীবন পরিত্যাগ করে অজয়, দামোদব, কোপাই, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, রূপনাবায়ণ, সুবর্ণরেখাব তটরেখা ধরে বংশপরম্পবায় নেমে এসেছিল সমতল ভূমিতে। এই সময় পর্যন্ত তাদের জীবন ছিল পশুপালন ও যাযাবব। তারপর নদীর অনতিদূরে মাটির সন্ধান পেয়ে তারা ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে ঘর বেঁধে বসবাস সুরু করেছিল। ক্রমে তারা শস্য বীজের সন্ধান পেয়ে শুরু করেছিল কৃষি ও পশুপালন নির্ভর জীবন। বৃষ্টি ও মাটির মিশ্রণে হলকর্ষণ করে শুরু হয়েছিল চাষ। মাটিতে হয় ঘাস সেই ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে পশু। মাটিতে হয় শস্য, মাটি দিয়ে ঘর। মাটির পাত্রে রান্না, মাটির পাত্রে আহার। মাটিময় জীবনে মাটিকে মা বলে ডেকেছিল তারা।

[নারী ও মাটি] সেদিনের মানুষ অনেক সভ্য হয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ ঘটেছিল। তারা দেখেছিল একটি মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়। শরীরে দেখা দেয় যৌবনের লক্ষণ। নারী মাসে মাসে হয় ঋতুমতী। রজঃস্বলা নারীর সাতদিন রক্ত ক্ষরণ হয়। তারপর তার সঙ্গে পুরুষের মিলন হলে সে হয় সন্তানবতী। দশমাস দশদিন পর নারী প্রসব করে সন্তান। মা বসুমতীর মধ্যে এমনি অবস্থা দেখেছিল তারা। আকাশ হতে বারিপাতে শুখনো পৃথিবী ভিজে যায়। আরও বারিপাত হলে ভিজে মাটি জল উগরিয়ে দেয়। তখনই মা বসুমতী হয় রজঃস্বলা। এই সময়

সাতদিন চাষ বন্ধ থাকে। তারপর হলকর্ষণ ও ধান্য রোপন। শস্য পরিচর্যা ও পরিশেষে শস্য লাভ। তাই ভূমিও মায়ের সমতুল্য।

[উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ] আদিম জীবন পরিত্যাগ পূর্বক কৃষিনির্ভর জীবনে এসে রাঢ়ের মানুষ লক্ষ্য করেছিল যে, সূর্য উত্তর পূর্ব কোন হতে ধীরে ধীরে দক্ষিণে গমন করে। ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব কোণে চলে যায়। তারপর সেখান হতে ধীরে ধবে এইভাবে ছয় মাস উত্তরে ও ছয় মাস দক্ষিণে সূর্য পরিভ্রমণ করে। ৭ই আষাঢ় সুরু সূর্যের দক্ষিনায়ণ। এইদিন অম্বুবাচী, ধরার এইদিন রজঃস্বলা শুরু। তারপর দক্ষিণায়ণে সমুদ্র হতে মেঘ এসে ধরায় জল বর্ষণ শুরু করে। চলে শস্য রোপন উৎসব। তারপর শস্য পরিচর্যা। ১লা মাঘ আবার সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু। এই সময় শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার পালা।

[সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব] ধীরে ধীরে রাঢ়ের মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব ঘটে। কৃষি নির্ভর জীবনে আসে ধর্মীয় প্রভাব। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী। বিষ্ণু থাকেন সাগরে মহাসর্পের উপরে। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীও থাকেন সাগরে তিনি সাগরদুহিতা। দেশে অরাজকতা দমনে বিষ্ণু এলেন শ্রীকৃষ্ণ রূপে গোপালকের ঘরে। তখন পশু পালন নির্ভর যাযাবর জীবন। আয়ান ঘোষও গোপালক। আয়ান ঘোষের ঘরে এলো লক্ষ্মীরূপিণী রাধা। অর্থাৎ দাক্ষিনায়ণ (আয়ণ) মকরক্রান্তি হতে নিয়ে আসে জলভরা মেঘরূপিণী লক্ষ্মী। জল পেয়ে ধরায় দেখা দেয় ফসলের প্রাচুর্য। তারপর লক্ষ্মী শস্যরূপে :— ধান, রাই, রমাকলাই, তিল— বাঁধা পড়েন চাষীর ঘরে। তুষলাব্রতের আগের আগের কয়দিন আউড়ি, চাউড়ি, বাউড়ি। অর্থাৎ শস্যলক্ষ্মীর ঘরে ঘরে আগমন। চাউড়ি দিনে লক্ষ্মী চাহেন এবং বাউড়ি দিনে তিনি চাষীর ঘরে বন্দী হন। আর কোন অভাব নাই। তারপর দিন হতে উত্তরায়ণ। সূর্যের আবার উত্তরে মকর ক্রান্তির দিকে গমন। অর্থাৎ লক্ষ্মী-রূপিণী মেঘ ফিরে যাচ্ছে সাগরে। ছড়ার মধ্যে "আর তুষালু থাকবে না মকর এসেছেন নিতে গো"।

[অম্বুবাচী-ভাঁজো-তুষু] দক্ষিনায়ণে মেঘবারি বর্ষনে ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী। এই দিন হয় ধরা রজঃস্বলা। এর পর কৃষিকাজ শুরু। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র মকর হতে জলবাহী মেঘ এসে ধরাসিক্ত হয়। ফসলে ভরে উঠে ধরা। তারপর ভাদ্র-শেষে জল না হলে ফসল শুকিয়ে যায়। তাই চাই জল। সে জল আশ্বিন কার্ত্তিকে ফসলকে সতেজ রাখবে। তাই ভাদ্রশেষে সাতদিনব্যাপী ভাঁজো পরব। মাটির পাত্রে রাঢ়ের মেয়েরা রমা কলাই দিয়ে শোষ পাতে তারপর অঙ্কুরোদম মাটির পাত্র-

ঘিরে চলে মেয়েদের নৃত্যগীত উৎসব। এইদিন ইন্দ্র দ্বাদশী তিথি। মেঘের অধিপতি ইন্দ্রের বন্দনা। মেঘরূপী লক্ষ্মী এসে শস্যরূপী লক্ষ্মীকে রক্ষা করার প্রার্থনা। তারপর শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও সবশেষে তুষালুব্রতের আয়োজন। তুষালুব্রতে চারিবৎসর ধরে চলে ভাই-এর মঙ্গল কামনা। অর্থাৎ ভাই-পুরুষ সুস্থ সবল থাকলে জমিতে হলকর্ষণ সম্ভব। বীজ বপন, ধান্যগাছ রোপন, পরিচর্যা। তারপর জলাভাব রোধের জন্য জল প্রার্থনা—উৎসব ভাঁজো। শস্য পাকলে তা ঘরে তোলার আয়োজন। সবশেষে তুষালু ব্রত। অর্থাৎ অম্বুবাচী-ভাঁজো-তুষু কৃষি নির্ভর জীবনে একই সুত্রে বাঁধা।

রাঢ়ের নদী অববাহিকায় মাটির সন্ধান পেয়ে মানুষ একদিন বেঁধেছিল ঘর। উর্বর মাটি ও জলের প্রাচুর্যে শিখেছিল ধানচাষের কৌশল। তারপর শস্য পেয়ে আনন্দে তারা উদ্‌যাপন করেছিল নানা উৎসব ব্রত। এই উৎসবব্রতগুলি তারই খণ্ডচিত্র। এগুলি যুগযুগ ধরে মানুষের পথ পরিক্রমার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে এই আধুনিক কালে আমাদের নিকট এসে পৌঁছিয়েছে। এর মধ্যে আমরা সেদিনের মনুষ্য সমাজের খণ্ডচিত্রের নিদর্শন পাচ্ছি। আর আনন্দরসে উদজীবিত হয়ে উঠছি।

বর্ধমানজেলার, কাটোয়া মহকুমার, কেতু গ্রামথানার রসুই গ্রাম (অজয় তীরবর্তী) হতে কুমারী জাহ্নবী মুখোপাধ্যায়ের তুষালুব্রত পালন থেকে এই বিবরণী ও ছড়াগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। সহায়তা করেছেন শ্রী রাধাশ্যাম আচার্য ও শ্রী সুনীল কুমার সরখেল। লেখক।

টুসু পরবে নারী মন

গোপা সরকার

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের টুসু উৎসবকে শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব বলা চলে না, এই উৎসবের মানবিক আবেদনই মুখ্য। মানব হৃদয়ের বিশেষ করে নারীমনের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় এই উৎসবের মূল উপাচার সঙ্গীতের মধ্যে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে এর শুরু, শেষ পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন। সারা পৌষমাস ধরে চলে সঙ্গীতানুষ্ঠান। গ্রামের বিবাহিতা, অ-বিবাহিতা-কিশোরীর দল সন্ধ্যাবেলা টুসু সরা বা মূর্তির সামনে বসে গান করেন। মনের কথা প্রকাশ করার বাহন হচ্ছে ভাষা। কিন্তু সেই ভাষার মাধ্যমেও সবসময় আমাদের গ্রামীন নারীরা নিজেদের সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ করার অবসর পাননা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সুখ দুঃখের গল্প করার সময়ই বা কোথায়? অথচ মনের মধ্যে জমে-থাকা কথার স্তূপ প্রকাশের পথ খোঁজে। প্রয়োজন হয় তাই উপলক্ষের, যার মাধ্যমে তাঁরা একে অপরের মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন। টুসু পরব এমন একটি অনুষ্ঠান, যা একান্তভাবে মহিলাদের নিজস্ব। (অবশ্য, পৌষ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ টুসু বিসর্জনের দিন পুরুষরাও যোগদান করেন।)

নারীমনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, হতাশা সবকিছুরই প্রতিফলন ঘটে থাকে টুসুগানে। সামাজিক দিক থেকে এই গানগুলির মূল্য অপরিসীম। টুসু নামেই দেবী—আসলে সে আমাদের অতি পরিচিতা রমণী, যার সুখ, দুঃখ, বেদনা—আমাদের গৃহের মেয়েদের মতই কখনও আমাদের হাসায় কখনও কাঁদায়। কয়েকটি গান বিশ্লেষণ করে একথার যথার্থতা অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক্। কোন এক গ্রামে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে টুসুর জন্ম। ইতিমধ্যে সে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে, মাকেই টুসুরানীর জন্য পাত্র খুঁজতে হয়। মায়ের ইচ্ছা সেই পাত্র 'ইস্টিশানের বাবু' হলেই ভালো, তাহলে মেয়ে মনের সুখে গাড়িতে চড়ে কত জায়গায় বেড়াতে পারবে। যে সাধ ছিল একান্ত আপনার, তা টুসুকে দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করেন গ্রাম্যবধূ। গেয়ে ওঠেন,

আমার টুসুর বিয়ে দুব ইস্টিশানের বাবুকে,
ওলো টুসু ভালোই হল চাপবি কত গাড়িতে।

মেয়েকে ভাল শাড়ী গয়নায় সাজাতে কোন মায়ের না ইচ্ছা হয়। তাই নানা ভূষণে মেয়েকে বিভূষিত করে তোলেন মা।

মাথা বাঁধার পরিপাটী গো
তায় পরাব বেল কুঁড়ি
বোম্বাই হতে পার্শেলেতে
আনব দীঘল চুড়ি
কটকে গড়হাব গহনা
ঢাকাতে চট করাবো
কোলকাতাতে রং করিয়ে
টুসুধনকে পরাবো !

পৃথিবীর মত শ্রেষ্ঠ ভূষণ তাই দিকে মেয়েকে সাজাতে পাবলে তবেই মাযের বাসনা পূর্ণ হয়। তাই তো দেখি, সুন্দর কবে কেশবিন্যাস করেই মা ক্ষান্ত হন না, তিনি ডাকযোগে বোম্বাই থেকে 'দীঘলচুড়ি' আনান। কটকেব গয়না বিখ্যাত, সেজন্য মেয়ের গয়না তৈরি করতে দেন কটকে। ঢাকার শাড়ীব তুলনা হয় না, মেয়েকে সেখানকাব বোনা কাপড কলকাতা থেকে বং করিয়ে না পরালে কি চলে ?

কিন্তু বিয়ে দিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার উপায় আছে ? 'টুসু' নামক মেয়েটির শাশুডী-ভাগ্য মন্দ। শাশুডী টুসুকে বড যন্ত্রণা দেয। তাই মাকে কামনা কবতে হয—

এ চালে পুঁই ও চালে পুঁই খাবো পুঁয়েব মেচুড়ী,
খেতে খেতে খবর এলো, মইচে টুসুব শাশুডী।
মরুগ মরুগ আরো মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো,
চন্দন কাঠে পুড়ি পরে অম্বিকানন ঘর যাবো।

শাশুড়ীর সঙ্গে ননদের অত্যাচারও আমাদের দেশে বিরল নয। বাঘবাঘিনা ননদিনীর জ্বালায অতিষ্ঠ হয়ে বধূ তাব মৃত্যুকামনা করলেও তাই অশোভন হইনা।

জৈড পাতা চাকা চাকা
বাঁশ পাতা সরু
বিঘা জুড়ে বাদাড দিব
ননদিনী মরুক।
ননদিনী মলে আমরা
কি বলে কাঁদিব
সরা ঢাকা জল নিয়ে
তুসুলা পূজিব।

দুঃখিনী নারীকে সপত্নীর জ্বালাও সইতে হয়। একসঙ্গে দুজনে থাকতে গেলে কলহও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কলহের জন্য অন্যের কাছে গঞ্জনা সইতে হবে কেন? এ দুঃখের কথা কাকেই বা বলা যায় টুসুকে ছাড়া! তাইতো অভিমানে বধূ গেয়ে ওঠেন—

একটি সিকায় দুটি হাঁড়ি
সে কি ঠইকর লাগে নাই
একটি লোকের দুটি বহু
সে কি ঝগড়া লাগে নাই।

আব একটি গানে দেখি পুত্রকামনায় কোন এক বন্ধ্যা নারী শিকড় বাকড়, চিনির জল খাওয়া প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ দেননা তীর্থে। তীর্থে কত মানত করেন কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। তাই তো হতভাগিনী, টুসুর কাছে আকুল হয়ে মনের দুঃখ নিবেদন করেন—

শিকড়-বাকড় কত খাবো, কত খাবো চিনির জল
হে ভগবান এই কারণে হে কত যাব রামেশ্বর।

টুসুগানে প্রেমও অপাংক্তেয় হয়ে নেই। গ্রামের কুমারী মেয়েরাও যেহেতু টুসুগানে অংশগ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু প্রেমবিষয়ক গান থাকা স্বাভাবিক। একটি গানের নমুনা দেওয়া হল:

কালো দেখেনা মলম জলে জল হৈল মোর এক গলা—
কে আছ গুণের বঁধু তুলে ধর এই বেলা।

আবার কোন এক বিবাহিতা রমণীর টুসু পরবে বাপের বাড়ি আসতে না পারার বেদনাও আমাদের মনকে নাড়া দেয়।

এত বড় পোষ পরবে রাখলি, মা পবের ঘরে,
ওমা পরের মা কি বেদন বোঝে
অন্তরে পুড়ায়ে মারে।
আমার মন কেমন করে, মাগো আমার মন কেমন করে,
যেমন তাতাকড়ায় খই ফোটে॥
মাথা ঘষে রইলাম বসে, আর আমার কে আছে
মা রইলো দূরান দেশে প্রাণ জুড়াবো কার কাছে?

অভিমানিনী মেয়ের বুক বুঝি বা ফেটে যায় শোল মাছের মত তার প্রাণও লাফিয়ে

উঠছে, তার মন প্রাণ ছুটে যেতে চাইছে বাপের বাড়ির টুসু পরবে যোগ দেবার জন্যে। দুঃখিনী মেয়ে অভিমানে গেয়ে ওঠে—

মায়ে দিল মাথা বেঁধে, দেখো মামী ফুল গুঁজে
বিদায় দেমা সংসারের কাজে,
আমি আসবো না তোর ঘরে।
আমার মন কেমন করে।
মাগো, যেন শোল মাছে উফল মারে।
এত বড় পোষ পরবে…… ॥

আমাদের সমাজে অর্থের লোভে পিতা নিজের সন্তানকে বিক্রয় করে দিয়েছেন এমন নিষ্ঠুর ঘটনাও ঘটে থাকে। এই ঘটনা হৃদয়বিদারক হলেও নির্মম সত্য। একটি টুসু গানে তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিতার বদলে এখানে কাকা একশ টাকা নিয়ে একজন বৃদ্ধের হাতে ভাইঝিকে তুলে দিয়েছেন। সেই বৃদ্ধকে নিয়ে মেয়েটির লজ্জার সীমা নেই। রানীগঞ্জ শহরে তার শ্বশুরবাড়ী। সেখানকার প্রতিবেশী বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে স্বামীকে ঠাকুরদা বলে পরিচয় দিতে হয় অসহায় মেয়েটিকে।

একশ' টাকা নিলি কাকা দিলিবে বুড়া বরে।
বুড়ার সঙ্গে চলতে গেলে রানীগঞ্জের শহরে।
রানীগঞ্জের লোকে বলে ওটি তোমার কে বটে।
লাজ লজ্জা সরম সজ্জা ঠাকুরদাদা হয় বটে।

এই নারী আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক চাপে নিষ্পেষিত অসহায় দুর্বল মানুষ চায় এমন একটি অবলম্বন যাকে কেন্দ্র করে সে ক্ষণিক শান্তি পেতে পারে। তাই সে সৃষ্টি করে দেব-দেবীর, যাদের কাছে হৃদয়ের সুখ দুঃখের ডালি উজাড় করে দিয়ে সাময়িক শান্তি বা স্বস্তি পেতে চায়। বলা বাহুল্য, টুসু উৎসব মূলত নারীরাই পালন করেন বলে টুসুগানে তাঁদের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে কয়টি গান আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে নারীর মনের পুরোপুরি চিত্র হয়ত পাওয়া গেল না তবু মাতা, কন্যা, বধূ প্রেমিকা হিসেবে নারীর যে পরিচয় টুসু গানে মেলে তারই সামান্য আভাস দেবার চেষ্টা করা হল।

টুসুব্রত কেন্দ্রিক চারুকলা

ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

বাঙালীজন জীবনের ব্রত ও উৎসবের প্রাণধর্ম প্রকাশ পায় চারুকলা ও প্রতীকায়নের মাধ্যমে। গ্রামের নারী পুরুষ অথবা শহুরে মানুষজন যেখানেই উৎসব ক্ষেত্রে সমবেত হন সেখানেই ভক্তি প্রকাশের আনন্দ প্রকাশের, নানা বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। আনন্দ শুধু উদ্বেলিত হয়ে ওঠার জন্য নয়, ভক্তি শুধু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাব জন্য নয। ভক্তি ও আনন্দ বস্তুকে কেন্দ্র করে, চারুকলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায বলেই মানুষ মানুষ। লক্ষ্মী পূজার সময় বিশেষ করে বার-লক্ষ্মী পূজার সময় দেখেছি বাঙালী গৃহস্থের ঘর দ্বার উঠোন দেওয়ালগাত্র আলপনায চিত্রিত হতে থাকে। দুর্গা পূজার সময় সেই একই মানসিকতা প্রতিমা নির্মাণে, ডাকের কাজে, পুষ্পগ্রন্থনে, গৃহসজ্জায়, নব অলংকারে, মিষ্টান্ন উপকরণে ও প্রসাদ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এই প্রবণতা শুধু বাঙালী মানসিকতারই পরিচয়বাহী নয। সারা ভারতের তথা। আবিশ্বের সাধারণ মানসিকতা এই যে ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশে বস্তু অবলম্বন, প্রতীক অবলম্বন এবং তারই ফলে বিচিত্র চারুকলার উজ্জীবন। তিরুপতির মন্দিবে অথবা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যাঁরাই গেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন এই দুই দেবতা নিজ নিজ স্থান পরিধিতে একজন সফল "ইনডাসট্রিয়ালিসট্।" দারুব্রহ্ম জগন্নাথজীকে কেন্দ্র করে অন্নব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, রেশম ও সুতি বস্ত্র, শংখ শিল্প, কাংস্য শিল্প, প্রস্তর মূর্তি, কাঠের কাজ, পুষ্পপত্র সজ্জা, গন্ধদ্রব্য, রঞ্জনসামগ্রী, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, সংগীত প্রভৃতির সীমাহীন আয়োজন হয়ে চলেছে সুদূর অতীত কাল থেকে। পুরী শহরে একজনও নারী বা পুরুষ বোধ হয় নেই, যিনি নাকি কোন না কোন শিল্পের সঙ্গে সৃষ্টিশীলভাবে যুক্ত নন। পুরীতে আট দিনের রথযাত্রা উৎসবের জন্য প্রতিবৎসর তিনটি বৃহৎ কাঠের রথ নির্মিত হয়। দারুশিল্পের মাধ্যমে উৎসব-মানস প্রকাশের এ এক পরম উদাহরণ।

রাঢ়ভূম অঞ্চলে দুর্গাপূজা আছে, রথযাত্রা আছে, আছে গাজন, বাঁধনা, সহরাই প্রভৃতি পরব। কিন্তু টুসু উৎসব যে ভাবে প্রাণ পায় তার প্রতি তুলনা নেই। রথোৎসব, দুর্গোৎসব, গাজন, দশহরা প্রভৃতি একদিন বা কয়েকদিনের উৎসব। কিন্তু

টুসু উৎসব চলে এক মাস ধরে। সারা পৌষ মাসের দিন-রজনী টুসু গানে, টুসু ব্রতপালনে উদযাপিত হয়। পৌষ মাস অন্নপূর্ণা। বাঙালীর ঘরে ঘরে তখন নতুন ধান্য, নতুন অন্ন, নবান্ন। বাঙালীর মন তখন নতুন আশায়, নতুন উদ্দীপনায় ভরা। কন্যা টুসু, দেবী টুসু, সখী বা সঙ্গিনী টুসু তারই সঙ্গে বাঙালীর ঘর আলো করে আহ্লাদের শিখা জালিয়ে দেয়, প্রাণে প্রাণে যত সাধ যত জল্পনা, মনে মনে যত সুখ যত যাতনা সবই গানে গানে প্রকাশ পায়।

টুসু উৎসবকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠ চারুকলার উদাহরণ ঐ সব গান। অজস্র অসংখ্য টুসু গান। সারা পৌষ মাস ধরে আবালবৃদ্ধবণিতা লক্ষ লক্ষ টুসু গান রচনা করেন। পুরানো বছরের গানও পূর্ণ কণ্ঠে গাওয়া হয়। আবার বহু প্রাচীন গান শীতের শাখার জীর্ণ পাতার মতো ঝরে যায়। টুসু গানের বিষয়—লৌকিক প্রেম, রামায়ণ, মহাভারত কথা, কৃষ্ণকথা, স্থানিক ইতিহাস, সামাজিক ঘটনা, বহমান লোক জীবন, রমণীর ব্যক্তিবদ্ধ সুখদুঃখ হিংসা ঘৃণা মান অভিমান প্রভৃতি। এই সব টুসু গানে শ্বাসাঘাত প্রধান ছড়ার ছন্দের সৌন্দর্য থাকে, শব্দ অলংকার ব্যবহারের কৃতিত্ব থাকে। তারই সঙ্গে থাকে সুরের বৈচিত্র্য। টুসু গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিধি নিয়ম নয়, লোকসংগীতের স্বাধীনতা থাকে। তবু টুসু গায়নরীতির একটি বিশেষ ঢঙ তৈরি হয়েছে। সেই একনিষ্ঠ ঢঙের সঙ্গে মিশেছে বৈচিত্র্য। বাঁকুড়া শহর, বিষ্ণুপুর, পোরকুল বা পুরুলিয়ার টুসু গান ঠিক এক সুরে গাওয়া হয় না। মল্লরাজ-ধানী বিষ্ণুপুরে শুনেছি টুসু গানে রাগ-রাগিনীর বিস্তার অথবা তোম তা না না না-র সংযোজন। টুসু উৎসবকেন্দ্রিক চারুকলার আর একটি দিক নৃত্য। টুসু গায়ক বা গায়িকাদের পায়ে পায়ে সুনিয়মিত শাস্ত্রসম্মত কোন নৃত্যবিধির পরিচয় প্রকাশিত হয না। তবু দলবদ্ধ এলোমেলো নৃত্যের মধ্যে থাকে আনন্দ প্রকাশের জোয়ার। ইদানীং কালে কোন কোন উৎসাহী সংস্থা উৎসব সময়ে বাঁধাধরা নিয়মে টুসু নাচ এবং গান পরিবেশন করার মানসিকতা বহন করছেন দেখতে পাই।

টুসু উৎসবের সঙ্গে টুসু মূর্তিকলার যোগ অর্বাচীন কালের। টুসু গানে শুনেছি

বাঁকুড়াতে দেখে এলম তিনটি টুসু যায় চলে।
হায়রে গেঁজায় নাইরে পয়সা লিতম টুসু দর করে ॥

এই গানে টুসু মূর্তি কেনার কথা বলা হয়েছে। পুরুলিয়ায় বা দক্ষিণ বাঁকুড়ায় অথবা হুগলী জেলার কানানদী অঞ্চলের টুসু মেলায় আমরা অজস্র টুসুমূর্তি দেখেছি। এই সব মাটির টুসুমূর্তি সোৎসাহে তৈরি করেন স্থানীয় কুমোরেরা।

মূর্তি পরিকল্পনায় অবশ্য কোন শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম নেই, কোন সাধকের বিশিষ্টসাধন দৃষ্টির প্রভাবও নেই। একটি সাধারণ নারীমূর্তি, সাধারণ দেহাতি পোষাক বা শাড়ী পরে দণ্ডায়মানা, নানা বর্ণরঞ্জিতা টুসু মূর্তিরই বহুল প্রচলন। শিল্পীর দক্ষতা ও গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মূর্তি বৃহৎ হয়, অলংকৃত হয়, বৈচিত্র্যময় হয়। দাঁড়ানো টুসু বা বসা টুসু—দু-রকম টুসু মূর্তি আমরা দেখেছি। বাহন হিসাবে ময়ূর অথবা ঘোড়া বা হাতিও দেখা যায়। পিঠো-পিঠি বসা জোড়া টুসু মূর্তিও দেখেছি পোরকুলের মেলায়। মকর বাহনা টুসু মূর্তিও চোখে পড়েছে। ত্রিমুখী টুসু মূর্তি, পঞ্চমুখী টুসু মূর্তিও দেখেছি। টুসু মূর্তির উদ্ভাবনা ভাদুমূর্তির প্রভাবে—এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছোতে চেয়েছেন পণ্ডিতেরা। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, ভক্তি ও আনন্দ শেষ পর্যন্ত মূর্ত অবলম্বন করে প্রকাশিত হবার মানবিক ও শাশ্বত প্রবণতা থেকেই ধীরে ধীরে টুসু মূর্তির প্রচলন হচ্ছে। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় টুসু মূর্তির যেমন প্রচলন, পূর্ব বাঁকুড়ায় বা মধ্য বাঁকুড়ায় তেমন নয়।

টুসুব্রত ও উৎসবকে কেন্দ্র করে মৃৎশিল্পকলার অভাবিত উৎকর্ষও ঘটেছে। বাঁকুড়া বীরভূমে দেখেছি ধর্মরাজকে কেন্দ্র করে মাটির ঘোড়া মাটির হাতি অকাতর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সৃষ্টি হয়েছে ঘোড়া হাতি সাঁওতালদের দেবতাদের জন্য। মনসা পূজা ও উৎসবকে অবলম্বন করে মৃৎকলার পরাকাষ্ঠা মনসার চালি, মনসার বারিঘট প্রভৃতি রচিত হয়েছে। তেমনি টুসু পূজা ও পার্বণের জন্য গ্রামেগঞ্জে শহরেনগরে তৈরি হয় টুসু ঘট ও টুসু খলা। পোড়া মাটির লাল রঙের টুসু খলা সত্যিই এক দর্শনীয় শিল্প সামগ্রী। টুসু খলার গড়নেও প্রকারভেদ আছে। একতল, দ্বিতল, ত্রিতল ও বহুতল টুসু খলা তৈরি হয় মানভূম, সামন্তভূম, ধলভূম অঞ্চলে। মাটির ছোট বড় সরার আকারে খলাগুলি তৈরি। বৃত্তাকার বড়ারের উপর বসানো থাকে ১০/১৫/২০ সংখ্যক মাটির প্রদীপ। প্রদীপ সংখ্যা বহুতল টুসুখলায় শতাধিকও হয়। ব্রতচারিনীরা প্রতিদিনের পূজাপুষ্প এই টুসুখলায় রাখেন এবং টুসুখলা স্থাপিত হয় ঘরের দেওয়ালে কোন তাক তৈরি করে অথবা কুলুঙ্গিতে। মকর সংক্রান্তির আগের দিন টুসু খলাকে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করে তোলা হয়। একতল টুসু খলার আর একটি লক্ষণীয় বৈচিত্র্য আছে। কোন কোন দক্ষ মৃৎশিল্পী এগুলিকে এমন করে তৈরি করেন যার ফলে ভাসিয়ে দিলে নদী, পুকুর বা বাঁধের জলে এগুলি ভেসে ভেসে চলে, ডুবে যায় না, কাৎ হয়ে পড়ে না। প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং ভাসানের দিন ভোররাতে খলাগুলি ভাসিয়ে

দেওয়া হয়। জলাশয়ে তখন আঁধার ভাঙা আলোর রোশনাই জাগে। শীতকম্পিত নদীর স্থির জলরেখায় আলোর আলপনা আঁকা হয়। রাজগ্রাম, সোনামুখীতে টুসু খলা তৈরীর নিপুণতা চরম উৎকর্ষ স্পর্শ করেছে, সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। টুসু খলায় প্রদীপ সজ্জার নেপথ্যে শুশুনিয়া পর্বতগাত্রের চন্দ্রবর্মা লিপির সঙ্গে অঙ্কিত শিখাসমন্বিত বিষ্ণুচক্রটির প্রভাব আছে, এ কথা বলেছেন কোন কোন পণ্ডিত।

টুসু ভেলা বা চৌদল এতদঞ্চলে লোকশিল্পবোধের আর একটি ঐতিহ্যধারা সৃষ্টি করেছে। টুসু গানে শুনেছি—"পোষ মাসে টুসু তুললাম, চন্দন কাঠের চৌদল্লা"। আমরা অবশ্য চন্দন কাঠের চৌদল্লা দেখিনি। বাঁশকাঠির ফ্রেম, রঙিন কাগজ, আঠা ও চুমকি সহযোগে এই সব ভেলা ও চৌদল তৈরি হয় পঞ্চরত্ন, নবরত্ন মন্দিরের অনুকরণে। এক ফুট দু' ফুট থেকে পাঁচ ফুট উচ্চতার চৌদল সাজিয়ে বিক্রী হতে দেখেছি বিষ্ণুপুরের চকবাজারে। পৌষমাসের শেষ দিকেই চৌদল তৈরি করে বিক্রী হয়। বিষ্ণুপুর শুধু প্রাচীন মল্ল রাজধানী নয়। এখনো পর্যন্ত এই শহর পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ 'City of Art'. এই শিল্পনগরীর অন্যান্য প্রশংসনীয় শিল্প অবদানের মতো টুসুর চৌদলও একটি স্মরণীয় অবদান। চৌদল বা চৌডল বলা হয় টুসু ভেলাকে। চৌদলের গর্ভগৃহে টুসুমূর্তি স্থাপন করে ভাসান যাত্রা করা হয়। মুখে মুখে টুসু গানের ঝরণা, হাতে বা কাঁধে টুসু চৌদল, সঙ্গে বাদ্যি বাজনা। টুসু পরবের আনন্দস্রোতে এমনি করে কলাবোধের প্রকাশ ঘটছে অনাদি কাল থেকে। বিষ্ণুপুরের চৌদলের গড়নের সঙ্গে পুরুলিয়ার চৌদলের গড়নগত পার্থক্য আছে। পুরুলিয়ার চৌদল অনেক বেশি ঊর্ধ্বমুখী, একহারা।

ছবড়ি পিঠা টুসু শিল্পকলার আর একটি দিকের পরিচয় বহন করছে। টুসু গানে শুনেছি :

তুষলা গোসাঁই
সব ঠাকুরকে লাড়ু দিলাম তোমার কটি চাই ?
পাঁচটি লাড়ু নটি লাড়ু, যে যার নিয়ম আছে।
ছবড়ি পিঠা খেয়ে যেন ধন পুত্র বাঁচে ॥

টুসু ভাসানোর পর ভোরের শীতে ব্রতচারিনীকে কুল কাঠ ও ছবড়ি ঘুঁটের আগুন পোহাতে হয়। তারপর তাকে খেতে হয় ছবড়ি পিঠা। আগের দিন এই পিঠা তৈরি করে রাখতে হয়। চাল গুঁড়ি, নারকেল কুরো দিয়ে এই পিঠা তৈরি করতে হয়। বৈষ্ণবধর্ম অধ্যুষিত রাধাকৃষ্ণ পূজা সেবাকে কেন্দ্র করে যেমন ছানা ও

চিনির খাজা, গজা, মণ্ডা, মতিচুর দানাদার প্রভৃতি মিষ্টান্নের উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি টুসুর উৎসববিধির নির্দেশে ব্রত আচরণের নিয়মে ছবড়ি পিঠার প্রচলন হয়েছে। এই অঞ্চলের বিখ্যাত পিঠা কাঁকরা পিঠার মতো সুস্বাদু নয় ছবড়ি পিঠা। তবু টুসুর সঙ্গে ছবড়ি পিঠার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ স্মরণীয়।

ধর্ম চিরকালই মানুষকে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্ম কতদিন ধরে কত ভাবেই না খ্রীষ্ট পুরাণ কথাকে চিত্রিত করেছে, মূর্তিময় করে তুলেছে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও ঐ একই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ধর্ম যখন নিছক আচার ও অনুষ্ঠান তখন তা শুষ্ক ও কৃত্রিম। ভাদু, পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল, ইতু প্রভৃতি ব্রত পূজায় আলপনা ও রঞ্জন দ্রব্যের ব্যবহার টুসু ব্রতেও দেখা যায়। টুসু ব্রতে শুধু দেবতার আরাধনা নয়, সৌন্দর্যেরও সাধনা চলছে। সৌন্দর্যের সেই সাধন জগতেই দেবতা এসে বসেছেন মানুষের পাশাপাশি। এই ভাবেই দেবতা হয়ে উঠেছেন প্রিয়। টুসুও আমাদের প্রিয় দেবতা। টুসু থলায়, টুসু ভেলায়, টুসু আলপনায় টুসু গানে সেই প্রিয়তাকেই নানা ভাবে আস্বাদন। সে আস্বাদনের শেষ নেই॥

লোকউৎসব

শিবেন্দু মান্না

বাংলার লোকধর্ম বাঙালীর আপন জীবনরসে বসায়িত বলে লোকগীতিতেও তার অনিবার্য প্রভাব এসেছে। ধর্মাচরণ করতে গিয়ে ধর্মের কথা বলতে গিয়ে আপন জীবনের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে।

টুসু লৌকিক দেবী—কোন পৌরাণিক পটভূমিকা তার নেই বলেই পূজা উৎসব এবং গীতে বাংলার লোকজীবনেব বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট—বাঙালী নিজেকে বাদ দিয়ে কখনও লোক দেবতার কল্পনা করতে পারেনি।

পূজা উৎসব :

টুসু উৎসব প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের পৌষালী শস্যের সুফলনের ও প্রাচুর্যের উৎসব। এ সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করছেন : 'It is a folk festival undoubtedly connected with the crop and the tusu festival is the worship of the Agricultural deity 'krishi Lakshmi.' The tusu festival is fundamentally a post-harvest folk festival of an agricultural society···Tusu is the agricultural festival of the Pousali crop (in the month of Poush) of the western border areas of Bengal'.

তুষু-তুষলী বা তোষলা ব্রতের সঙ্গে টুসুর নামরূপের ঐক্য থাকলেও কার্যত পূজাবিধিব পার্থক্য আছে। লোকমুখে টুসুর অনুষ্ঠান পদ্ধতি যা জানা গেছে—"অগ্রহায়ণ মাস শেষ হবার পর, পৌষ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের মেয়েরা স্থাপনা করে তাদের আদরের টুসু দেবীকে। অগ্রহায়ণ মাসের নবান্নের নূতন ধানের তুঁষ মেয়েরা সঞ্চিত করে রাখে। পরে অগ্রহায়ণ শেষ হলে পৌষের সূচনায় সেই সঞ্চিত তুঁষ নূতন সরায় ভর্তি করে রাখে। সরাটি গাবান হয় গুঁড়ি গোলা জলে। সরাটির গায়ে আঙ্গুলের সাহায্যে পাঁচটি বা সাতটি সিঁদুরের লম্বা দাগ দেওয়া হয়। সরাটির মধ্যে তুঁষের সঙ্গে পাঁচটি বা সাতটি গুঁড়ির ও কাঢ়ুলি বাছুরের গোবরের

ঢেলা বা গুলি রাখা হয়। টুসু গানের মধ্যেই এই পদ্ধতির পরিচয় আছে—নবান্নের ধান ভানি / দিন থ্যান করে / কাচুলি বাছুরের লাদ রাখি / টুসু মায়ের তরে ; সেই সঙ্গে সরাটিতে রাখা হয় আকন্দ ফুলের মালা ও গাঁদা ফুলের মালা। পরে সরাটি আর একটি নূতন সরা দিয়ে ঢাকা দিয়ে সেটি সযত্নে ঘরের কুলুঙ্গিতে বা পিঁড়ির উপর তুলে রেখে দেওয়া হয়, এইটিই টুসুদেবী। তারপর সারা পৌষ মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় ফুল ও প্রদীপ দিয়ে পূজা করা হয় ভোগ নিবেদন করা হয়। আর হয় টুসুর গান।...সমস্ত পৌষ মাস জুড়ে এইভাবে পূজা হওয়ার পর মাসান্তে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে হয় তার বিসর্জন। বিসর্জনের দিন অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শোলা ও নানারঙের কাগজ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের মন্দিরাকৃতি চতুর্দোলা বা চৌদলায় টুসুমণিকে রেখে ফুল ও মালার দ্বারা সাজিয়ে মেয়েরা গান করতে করতে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যায় নিকটবর্তী নদীতে বা পুকুরে।

তুষ-তুষলি ব্রত এবং তার পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে : আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : পশ্চিম বাংলায় তুষ তুষলী নামে একটি মেয়েলি ব্রত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে এই ব্রত উদযাপন করিতে হয়। ....ইহাতে গোবরের সঙ্গে তুষ মিশাইয়া কতকগুলি নাড়ু পাকাইতে হয়। ততদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু দূর্বা দিয়া পূজা করিবার পর তাহা একটি মালসায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তারপর মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মালসাগুলি মেয়েরা হাতে বা মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া কোন পুকুরে কিংবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়. কোন কোন জেলায় ছড়া বলিয়া নাড়ুগুলি পূজা করিতে হয়।'

তুঁষ-তুষালি বা তোষলা ব্রত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনবদ্য চিত্র-রূপময়ী ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

"—অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে কালো দাগশূন্য নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এক পাঁচগাছি করে দূর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে শিম মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সার মাটি দিয়ে খেত উর্বর করে তোলার ব্রত। ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গে এক পশ্চিমবঙ্গের আর এক হলে ছড়াগুলি পড়তে পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবনযাত্রার এমন একটি পরিস্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না।"

কিন্তু তোষলা ব্রতের সঙ্গে টুসু পূজা উৎসবের মৌলিক পার্থক্য আছে॥ তোষলা বা তুষতুষলি ব্রতের সঙ্গে টুসু পূজা-উৎসবের মৌলিক পার্থক্য আছে॥ তোষলা বা তুষতুষলি ব্রতের সঙ্গে টুসু পূজার পার্থক্য যেভাবে পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) তুষতুষলি পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্বতন পূর্ববঙ্গে। অপ্রধান, ব্রত কিন্তু টুসু পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের একটি প্রধান ব্রত।

(২ তুষ-তুষলি পূজার অন্যতম উপকরণ ছড়া, কিন্তু টুসুর প্রধান উপকরণ গান।

(৩) তোষলা ব্রতটি সকাল বেলার ব্রত, প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে, কিন্তু টুসু পূজা ও গান হয় সন্ধ্যা বেলায়।

(৪) তুষতুষলি সধবা বিধবা কুমারী সকল শ্রেণীর মেয়েদের ব্রত কিন্তু টুসু মূলতঃ কুমারী ব্রত। বিবাহযোগ্য কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত করে থাকে।

(৫) সর্বাধিক উল্লেখ্য পার্থক্য — পৌষ সংক্রান্তিতে জাগরণ উৎসব। এই সময় যে আদিম ও অমার্জিত রূপটি প্রকট হয়ে ওঠে।

যদিও Fertility Cult সম্পর্কিত ব্যাপারে তোষলা ব্রতের সঙ্গে টুসু পূজার আত্মিক মিল আছে তথাপি একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে তোষলাব্রত ও টুসু পূজা এক জিনিস নয়। অনেকেই এর কিছু পরিমাণ আত্মগত মিল দেখে বিচারে ভুল করেন, কিন্তু লোকউৎসবে পার্থক্য জেলার অধিবাসী জল-বায়ু-মাটি ভেদে ঘটে থাকে। "টুসু, দ্রাবিড়, অস্ট্রীক ভাষাবর্গের কোলমুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, ভূমিজ [illegible]ইয়া-কুর্মি মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাস্যা দেবী", কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে—"টুসু রাঢ় অঞ্চলের একটি লৌকিক শস্যোৎসব। মেদিনী ভাষার পশ্চিমবঙ্গে এই [illegible] তুষ-তুষলী ব্রত বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে এবং পুরুলিয়া জেলার এই [illegible]" ॥ এই মন্তব্য আমরা সর্বাংশে মেনে নিতে [illegible]। অঞ্চল ভেদে, অধিবাসী জল-বায়ু মাটি ভেদে উৎসবের যে রূপান্তর। ঘটেছে সেটি কেই বিধৃত করেছে—'Fertility Cult বা Harvest Festival'র দোহাই দিয়ে এই লোকউৎসবের বহিরঙ্গ উপকরণকে অস্বীকার করলে আমরা মনে করি উৎসবের প্রাণবেগ বা Life force-কে অস্বীকার করা হয়। এখানে আমার জিজ্ঞাস্য দুর্গাপূজার বজয়া উৎসব [illegible] কি একই জিনিস? আত্মিক মিল থাকলেই উৎসবের প্রকারভেদ থাকবে না একথা বলা যায় কি? তুষ তুষলি বা তোষলা ব্রত-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ও সমাপ্তি সূর্য বন্দনায়। টুসুও কি তাই? তুষ তুষলি ব্রতটির টুসু সম্পর্কে একথা [illegible] কোন সন্তোষজনক কারণ নেই। একদিকে প্রাচীন গাড়োয়ালা [illegible] কাঠিন্য এবং তজ্জাত নিজস্ব সংস্কৃতি আর এক দিকে

আর্য সংস্কৃতি প্রভাবিত গাঙ্গেয় সমতলভূমির সংস্কৃতি অর্থাৎ আর্যেতর এবং আর্য প্রভাবিত সংস্কৃতির দ্বিমুখী ধারা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ তথা মানভূম, ছোটনাগপুরের বিচিত্র লোক সংস্কৃতির উৎসমূল এবং এই উৎসমূলে আছে টুসু প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী। সুতরাং এই অঞ্চলের পূজা পদ্ধতিতে প্রকৃতিগত মিল থাকলেও বঙ্গের সমতলভূমির সঙ্গে পার্থক্যও প্রচুর একথা মানতে আপত্তি থাকার কথা নয়,, এবং সেই কারণেই তোষলা ব্রত ও টুসু পূজা সমার্থক নয়॥

নামকরণঃ টুসুর নামকরণ এবং উদ্ভব নিয়ে ভাষাতত্ত্বগত ও প্রজননগত (fertility cult) আলোচনা অনেকেই করেছেন। ভাষাতত্ত্বগত বিচার করতে গিয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন—"দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হতে পারে" অর্থাৎ তুষু>টুসু। কেউ কেউ আবার পরিষ্কারভাবেই বলেছেনঃ "টুসু ও তুষু অভিন্ন হতে পারে, হয়ত স্থান বিশেষে উচ্চারণ পার্থক্যে একই শব্দ ভিন্নরূপ ধরেছে।" আবার এই মতও পাচ্ছি যে, "পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত মাস হল পৌষ, পুষ্যা নক্ষত্রের অন্য নাম তিষ্য," তিষ্য>তুষু>টুসু। এ ছাড়া আরেকটি মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ "মনে হয় টুসু নামটির উদ্ভব হয়েছে 'উষা' বা 'ওষা নামক ব্রতগুলি থেকে। উড়িষ্যার পাহাড়ী অঞ্চলের হিন্দু ভাবাপন্ন ভুঁইয়ারা এখনও এই উষা বা ওষা ব্রতগুলি পালন করে থাকে…এই উষা বা ওষা শব্দটিই এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয়ত টুসুতে পরিণত হয়েছে।"

উৎসমূলঃ টুসু উৎসবের উদ্ভব কাহিনীর মূলে প্রায় সকলেই fertility cult, magic power, Harvest festival ইত্যাদির কথা বলেছেন। মোটা-মুটিভাবে আমরাও স্বীকার করছিঃ কৃষির অধিক ফলন, পাহাড়িয়া নদীতে চাষের জলের সুবিধা, সূর্যের পর্যাপ্ত আলো, জমির উর্বরতা, সন্তান লাভের কামনা, হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ও শস্যরক্ষা ইত্যাদি বিচিত্র উদ্দেশ্যসাধক ব্রত এই টুসু।

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে টুসু উৎসবের বয়স কত? সে কথার উত্তর সহজে মেলে না, এর প্রাচীনতা সম্পর্কে একটি ছোট্ট উত্তর দেয়া চলে, টুসু মানভূম, ছোটনাগপুর অঞ্চলের জাতীয় উৎসব।

টুসু সংগীত ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

চিত্ত মণ্ডল

প্রসঙ্গ কথা ঃ

কোন কোন লোকচায়নিক রাজনীতিসম্পৃক্ত টুসু সংগীতকে টুসু গান না বলে এঙ্গেলসের ভাষায়, [১] রাজনৈতিক লোকসংগীত বলে চিহ্নিত করতে চান তাকে। এই শ্রেণীর লোকচায়নিকরা সম্ভবত লোকসংগীতের জাতপাত নিয়ে একটু বেশীমাত্রায় সংস্কারবাদী। কেননা, এরা লোকসংগীতের সুর, লয় কিংবা গায়ন-পদ্ধতির চেয়ে বোধ হয় গানের বিষয়বস্তু এবং তার উদ্দিষ্ট (molte)-কেই বেশী মূল্য দেন। যদি তা ই বা না হবে, তবে টুসুতে রাজনীতি কিংবা সামাজিক ইতিহাস জড়ালেই তাকে রাজনৈতিক লোকসংগীত বলে নির্দেশ করতে চান কেন ? এই দিক থেকে বিচার করলে গণসংগীতের বিষয়বস্তুতে যদি লোকসংগীতের সুর এবং গায়ন-পদ্ধতির ছাপ থাকে তবে কি তাকে গণসংগীত না বলে বলা হবে লোকসংগীতাশ্রিত গণসংগীত ? কাজেই, টুসু যে মাসের গানই হোক না কেন, কিংবা এর সংগে যে কার্যকারণ-জনিত উৎসবই জুড়ে থাক না কেন, লোকসংগীতের চংক্রমণশীলতা ও পরিবর্তনশীল বিবর্তনের কারণেই এর সংগে রাজনীতি জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। কাজেই গণসংগীত ও লোকসংগীতের মৌল পার্থক্য তার বিষয়বস্তুতে নয় ; বিভিন্নতা এর সুরে, মাত্রা, তাল এবং গায়ন পদ্ধতিতে। গণসংগীত ও লোকসংগীতের বিষয়বস্তু তাই একই রাজনীতি হলেও ক্ষতি নেই, দুইয়ের পার্থক্য ধরা পড়বে তার সুরে।

এবং উভয় গানেরও মৌল ধর্ম ভিন্নার্থক। গুলিয়ে ফেলার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। লোকসংগীতের একটা বড় ধর্ম এর সুরের আঞ্চলিকতা এবং এ গান অচেতন সমষ্টি-সৃষ্টি। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে তার সংগে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গী এবং পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গী।[২] এই আঞ্চলিকতা থেকেই লোকসংগীতের গায়কীর উৎপত্তি। লোকসংগীতের এই

১. F. Engels, Letter to Hermann Schlueter, May 15, 1885, 'Literature and Art' p. 143-144.

২. লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম : হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পৃ. ৩৮

ঢঙ ও গায়কীকেই বলা হয় সুরের গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতা। কিন্তু গণসংগীতের বেলায় ঠিক এর উল্টোটি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস[৩] বলেছেন: স্বদেশ চেতনা যেথানে মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিললো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম। এবং এই সংগীতের সুরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতপ্রধান এবং তেজোদ্দীপ্ত। এ নিয়ে বহুবিধ সৌরিক (tunic) সৃজনশীল পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। এ কারণেই টুসু গান লোকসংগীত এবং তার সংগে সময়োচিত রাজনীতি যুক্ত হয়ে পড়লেও সুর গায়কী এবং আঞ্চলিকতাই এর পার্থক্য নির্দেশ করবে। একারণেই রাজনীতি বিষয়ক টুসু গানকে রাজনৈতিক লোকসংগীত বলার কোন মানে নেই এবং মানের যুক্তিও নেই। যেহেতু টুসু সমাজমৌল, সেহেতু সমাজমনস্ক লোকজনের (folk) সচেতনতার ছাপ এতে পড়লেও পড়তে পারে। তাই বলে তা লোক-সংগীতের ধর্মচ্যুত হয় না।

বিশ্লেষণ:

এই প্রেক্ষায় রাজনীতি-বিষয়ক টুসু সংগীত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অনেক ইতিহাসই মার্জিত জনগণের লিখিত গ্রন্থে থাকে না, লোকসংস্কৃতির পাতায় তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবং ঠিক তেমনি টুসু গানেও এমনি ধরনের বহু সামাজিক ইতিহাস এবং গণমানুষের সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর অংকিত আছে। কিন্তু সংগ্রহের অভাবে আজ তা কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। তবু, এখনও বহু টুসু সংগীত রয়েছে, যার শরীরে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামী চেতনা ও উপাদান, ছড়িয়ে আছে। এর রেণুতে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না মিললেও বিচূর্ণিত স্মৃতি মিলবে। এবার পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা যাক:

হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন: টুসু মূলত কৃষি উৎসব। এবং এবং সে লৌকিক দেবতা কিন্তু লোক-মানসে সে মহিমান্বিত জনগণেরই প্রতিনিধি রূপে বিরাজমান। এ কারণে, জনগণের নিজের মনোবাসনা, অভাব অভিযোগের ছবি তার সামনে তুলে ধরতেও যেন তাঁদের দ্বিধা নেই। তাঁদের সেই কামনা শুধু যাচনাই করে না, রাগ করতেও জানে। তাই টুসু গানে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা যখন জনসাধারণের মনের খেদে আপ্লুত হয়ে পড়ে, তখন সেই ঘটনাও তাদের টুসু উৎসবের সংগীতেরই অঙ্গে জড়িয়ে যায়।

মানভূমের বাঙালী অধিবাসীদের বাংলার সংগে যুক্ত হওয়ার দাবী চিরদিনের। তাঁরা বাঙালী, তাই তাঁদের মাতৃভাষাও বাংলা। কিন্তু বিহার সরকারের সব

৩. পূর্ববৎ পৃ. ১৪৯

অত্যাচার মাথা পেতে তাঁরা নিলেও, চাপিয়ে দেয়া হিন্দীকে তাঁরা কখনও বরদাস্ত করতে পারেননি। মামভূমের বঙ্গভাষাভাষী মানুষের জন্মগত অধিকারকে তাই বিহার সরকার চিহ্নিত করলেন 'হিন্দী বিরোধী আন্দোলন' রূপে। আর একারণেই বাঙালীদের ওপর চললো দমন পীড়ন, অত্যাচার। ১৯৫৫ সালের এই ঘটনা টুসু পরবের সংগীতে এবং টুসুব্রতীদের কণ্ঠে সোচ্চার সেই গানের কণ্ঠে দরদ, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে লৌহদৃঢ় সমুন্নতি।

গান. ক. ১.

এই ধরনের একটি গান ঃ

শুনরে বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ দেখাই [৪]

এই গানটির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিকতা, ঠিক তারই পাশাপাশি বিভেদকামী মনোভাবের প্রতি উচ্চারিত সতর্কতা। বিহার সরকারের ভাষানীতিই যে ভারতের বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে চিড় ধরাবে, সেই কথাটাই জোরের সংগে বলা হয়েছে এই গানে। তবে গানটিতে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যের দাবীও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই দাবী রাজনৈতিক।

বাংলা ভাষা বাঙালীর মাতৃভাষা, মাতৃভাষার স্তন্য পান করেই সে বড় হয়েছে। অতএব তাকে ত্যাগ করার মানে মাকেই পরিত্যাগ করা। সন্তান যেমন কখনো তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, ঠিক তেমনি মাতৃভাষাকেও। মানভূমের টুসু ব্রতীদের কণ্ঠে সেই কথাই ঘোষিত হয়েছে আরেকটি গানে।

গান. ক. ২.

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তাকে ?
বাংলা ভাষারে ॥
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।

---

৪. বাংলার পল্লীগীতি : চিত্তরঞ্জন দেব, পৃ. ১১৬

এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাত পুরুষের হক পাটা
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষার চির অধিকার,
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার ॥ [৫]

এই গানের প্রথমাংশে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট অবদান বর্ণিত হয়েছে। শেষ দিকে জনসাধারণের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ভবিষ্যতে দেশের সম্ভাব্য পরিণতির আশংকা করা হয়েছে।

গান. ক. ৩.

ঠিক এমনি ধরনের আরেকটি গানের উল্লেখ করা যাক। এই গানে বাংলার অবদানের কথা বর্ণিত হলেও গোটা গানটির সংগে গ্রামীণ বাংলার লোকজ ঐতিহ্যাশ্রিত উপাদান জড়িত আছে। এতে উল্লেখিত হয়েছে মনসামঙ্গল, ভাদু এবং টুসু পরবের কথা। এই ঐতিহ্যাশ্রয়ী উপাদানের সংগে মিলেছে গ্রাম বাংলার লোকমানসের ছাপ তথা আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর।

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে
মেঠো সুরের গান চুয়া
বাংলা গানের ছড়া কেটে
আষাঢ় মাসে ধান রুয়া।
মনসাগীতি বাংলা গানে
শ্রাবণ-জাঁত-জঙ্গলে
চাঁদ বেহুলার কাহিনী গাই
চোখের জলে গান বলে।
বাংলা গানে করি লো সই

---

৫ ঐ, পৃ. ১২৭

ভাদু পরব ভাদরে
গরবিণীর দোলা সাজাই
ফুলে ফুলে আদরে।
বাংলা গানে টুসু আমার
মকর দিনে সাঁকরাতে
টুসুর ভাসান পরব টাঁড়ে
টুসুর গানে মন মাতে।[৬]

মানভূমের ভাষা আন্দোলন বা বাঙালী বিহারী সমস্যাভিত্তিক আরো ক'একটি গান প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা যাক :

গান: ক. ৪.

ও তুই চলে যা মানে মানে
রইতে নারি তোর অনাদরে ॥
অনাহারে লোক মরিল
হুড়া পঞ্চার গ্রামেতে,
এক কলমেই লিখে দিল
সবাই ভিখারী বটে ॥
মাতৃভাষার টুঁটি টিপে
উঠাল আদালতে,
তাই তো এখন চায় না রে মন
অনাহারে রহিতে ॥[৭]

এই গানটিতে হুড়া পুঞ্চা গ্রামের অনাহারের মৃত্যু সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। হয়ত দেশের সামাজিক ইতিহাসে এর ঠাঁই মেলেনি। কিন্তু জনসংযোগের এই মাধ্যমে (media) তা অম্লান এবং এখন জনগণমনে স্মৃতির মত কখন আলোতে দীপ্ত।

গান. ক. ৫.

কিন্তু বিহারের এই অকর্মণ্য রাজপুরুষদের এই সব কাজে প্রতিবাদ করতে গেলে জনগণের কণ্ঠরোধ করতে ইস্পাত-দৃঢ় হাত নেমে আসে। অকুতোভয়

---

৬. ভাদু ও টুসু : রামশঙ্কর চৌধুরী, পৃ. ৬১
৭. বাংলার পল্লীগীতি : চিত্তরঞ্জন দেব, পৃ. ১২৫

ব্রতিনীদের টুসু জাগরণের গানে সেই প্রতিবাদী ইতিহাসও জড়িত। এই রাজনৈতিক ইতিহাস কণ্ঠরোধ করে স্তব্ধ করা যায় না।

টুসু লো কি দশা হবে,
আম্‌দের কথা বললে দিগাব গারদ
ঘরে নিয়ে যাবে।
এড়েং ব্যাড়েং বইল্লে তবে অরা
আম্‌দের ছাইড়িবে,
ওলো কি দশা হবে।[৮]

টুসু গানে সমসাময়িক ঘটনাবলী চিত্রিত হয়, সে কথা আগেই বলেছি। দেশের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং কৃষক আন্দোলনের ছবি ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার লোক-কবিদের রচনায়।

খ. কৃষক আন্দোলন : ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর ও প্রান্তিক চাষীদের সংগ্রামী মেজাজ দর্পণের মত প্রতিফলিত করেছে কিছু টুসু গান। জোতদার এবং জমিদারদের অত্যাচারের ছবি এইসব গানে আঁকা যেমন, তেমনি জড়িয়ে আছে চাষীদের মৌলিক অধিকারের কম্বুকণ্ঠ ঘোষণাও। কিছু টুসু গান সংকলন করে সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনের একটি সামগ্রিক দৃশ্যারন চিত্রণ করা যেতে পারে।

গান. খ. ১.

পৌষ মাসে টুসু পরব। সাঁওতাল-খেড়িয়া-ভূমিজ-মাহাত-লোধা, বিশেষত ক্ষেতমজুরদের মধ্যেই এই উৎসব সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন এ উৎসব সমগ্র জেলার সকল মানুষের। সকলশ্রেণীব মানুষজনই এতে মেতে ওঠে। পৌষ মাসে উৎসব হলে তাকে বরণ করতে যে গোলা ভর্তি ফসল চাই। মাঠে তো ধান ফলেছে। কিন্তু সে ধান যাবে কার ঘরে? চাষীর, নাকি ভূস্বামীর? সেই প্রশ্নটাই এই গানের বড় প্রতিপাদ্য :

পৌষ অ্যাসেছে সাধের টুসু
প্যুজব তোমায় ফুল দিয়ে—
তুমার ক্ষেতের ধান তুলেছি
সে ধান যাবে কে লিয়ে?

চাষীদের বঞ্চিত হবার বহু ঘটনা বর্ণিত আছে এমনি বিভিন্ন গানে।

৮. দেব, পূর্ববৎ, পৃ. ১২৫-১২৬

গান. খ. ২. / বর্গাদারের জমির রেকর্ড

কংগ্রেসী রাজত্বে বর্গাদাররা কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, কিভাবে তৎকালীন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের রক্তচক্ষু এবং আমলাতান্ত্রিকতার দৌরাত্ম্যে বর্গাদারেরা ক্লান্ত, তারই একটি নিটোল চিত্র ধরা পড়েছে এই গানটিতে :

বর্গাদারের জমির রেকর্ড হবেক ব্যল্‌ল আইনে—
সেই আশাতে সাক্ষী লিয়ে দাঁড়াই ছিলাম লাইনে।
কালীপুরের শংকরনারান তেই দেখে তাই চোক রাঙায়
ব্যল্‌ল জলের পুঁটি মাছ তুই—মরবি উঠলে ড্যাং ডাঙ্গায়।
রেকর্ড করা নাইক হ্যল—ছাড়াই দিলেক জমিদার
কংগ্রেসী রাজত্বকালে বুক ফাটলো বর্গাদার।

উদ্ধৃত গানটিকে বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন কংগ্রেস আমলের সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী ভূমিনীতি এবং তাদেরই তল্পীবাহক শূন্যগর্ভ আমলাতান্ত্রিকতার সন্ধান মিলবে। গানটি তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক নৈরাজ্য এবং পীড়নের দলিল হিসেবে সাক্ষী দেবে। কংগ্রেস রাজত্বে বর্গাদারের নামে জমি রেকর্ড করার আইন ছিল। অথচ সেই আইনে বর্গাদারের জমি রেকর্ডভুক্ত হয়নি। ভীতি প্রদর্শন করে বর্গাদারদের রেকর্ড করার লাইন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই চিত্র তৎকালীন সমাজের নিত্যদিনের সঙ্গী। গানের এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ারই কালীপুরে, গানে তা সুচিত্রিত আছে।

গান. খ. ৩. / লেভি ও পুলিশী জুলুম

কংগ্রেস আমলে নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল : দেশের খাদ্যশস্য ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য চাষীদের উৎপাদিত ফসল থেকে লেভি দিতে হবে। অজন্মা কিংবা মহামারীও সেই নীতি থেকে সরকারকে টলাতে পারে নি। লেভি না দিলে আইন ছিল, সেই আইনে চাষীকে জেল দেয়া যেত, তার বিরুদ্ধে রুজু হতো মামলা। এবং পুলিশী অত্যাচারে চাষী হত গৃহহীন। এই পর্যায়ের দুটি গান উদ্ধৃত করা যাক :

ধান উঠেছে খামারে টুসু—ধান ঝাড়া হলে পরে
লেভির নোটিশ ঘরে আসবেক—লেভি লিবেক জোর করে।
জমির চেয়ে লেভি বেশী ভ্যাবতে জীবন যায় উড়ে
বর্গী অ্যাসে শ্রমের ফসল লিলে মাথা যায় ঘুরে।

মিলের মালিক পওসাওয়ালা গোঁফে দিচ্ছে তা
আমরা গরীব লেভি দিতে বুকের ভিতর লাগছে ঘা।

কিন্তু দ্বিতীয় গানটিতে অত্যাচারের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে চাষী সমাজের রুখে দাঁড়াবার, বজ্রকণ্ঠের প্রতিবাদী ভাষা :

জমি নাই যার তারও লেভি এ কেমন ধারা ?
লেভি তুমি দিও না টুস্থ হইও না ঘর ছাড়া।
লেভি লিতে পুলিশ অ্যালে মারবে গো ঝাঁটা
আইন কানুন ম্যানব নাইক ভ্যাঙব বুকের পাটা।

সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে চলেছিল যেন মগের মুল্লুক। এ যেন সেই বর্গীর হামলা। তখন গানটিতে লোককবির মনে 'বর্গীর বিচুর্ণিত স্মৃতিও' ধরা পড়েছে। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গানটিতে তৎকালীন কংগ্রেসী বিভিষিক্যময় অত্যাচার, জোরজুলুম এবং চাষীমনে আতংক ধরা পড়েছে। যার জমি নেই, তার নামেও সেদিন লেভির নোটিশ আসতো। লেভি আদায়ের নামে পাঠানো হতো পুলিশ। পুলিশ জবর-দস্তির ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করে নিজের পকেটে পুরতো।

কিন্তু কংগ্রেসীদের সেই দুঃশাসনের তিমির রাত্রি কেটে গেছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের সরকার। সে সরকার কৃষকদের নানা সমস্যার সমাধান করেছেন। তার মধ্যে আছে মজুরী বৃদ্ধি, বর্গা-জমি নথিভুক্ত, খাজনা মকুব ইত্যাদি। টুস্থ গানে পরিবর্তিত সেইসব বিষয়ও পেয়েছে।

গান. খ. ৪. / মজুরী বৃদ্ধি

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসেই কৃষকদের জন্য কতগুলো কার্যসূচী হাতে নেন। এর মধ্যে আছে : ১. ভূমি সংস্কার আইনের আমূল পরিবর্তন ; ২. বেনামী জমি উদ্ধার ; ৩. খেত মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি এবং ৪. বর্গাদার উচ্ছেদ বোধ ইত্যাদি। চাষীদের দৈনিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়াতে চাষীরা আর জমিদার জোতদারের ক্ষেতে কাজ করতে যায় না। ঐক্যবদ্ধ সেই কৃষকরা সরকারের ফুড ফব ওয়ার্ক এ ঝাঁপিয়ে পড়ে :

দু'টাকাতে করব নাই কাজ-বেতন লিব আট টাকা
যে না দিবে, নাইক যাব ব্যলছে করিম কাকা।
সরকার দিচ্ছে তিন কে. জি. গম দুই টাকা এই হাতে—
কাজ কি টুস্থ রেট খ্যাটে রেট আজকে ইখন ক্যামাতে।

কৃষক-ঐক্যের ফলে বৃহৎ সম্পত্তির মালিক কিংবা জোতদারের আগের মত কম পয়সায় কিংবা রেট খাটিয়ে পাচ্ছে না।

গান. খ. ৫. / ভাগ চাষ রেকর্ড

নতুন সরকারের নীতি অনুযায়ী বর্গাদারদের জমি নথিভুক্ত হওয়ার পথে এখন আর কোন বাধা নেই। পুরুলিয়ার কালীপুর থানার জে. এল. আর. অফিসে ভাগচাষ রেকর্ডের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে একটি গানে ঃ

কালীপুরের জে. এল. আর. অফিস লোক গম্‌গম্‌ করিছে
কি হচ্ছে কি হচ্ছে টুসু ? ভাগচাষ রেকর্ড হচ্ছে।
চাটুজ্যাদের বাড়ুজ্যাদের চণ্ডবণ্ড নইক আর—
বাইক বহালের জমিগুলান রেকর্ড ক্যরল বর্গাদার।
অরে ছ্যাডাতে ল্যারবেক টুসু—ক্যারেও ছুটা চক্ষু লাল
লাঠি পিঠে ড্যাং দেখায়ে শাসন কঁরার খতম কাল।

অত্যাচার ও বঞ্চনার কাল শেষ। কিন্তু পূর্বতন রাজত্বের অত্যাচারের স্মৃতি এখনও এই গানটিতে জাজ্বল্যমান।

গান. খ. ৬. / সংগ্রামী ঐতিহ্য

সেই মার-খাওয়া কৃষক এখন নতুন উদ্যমে রুখে দাঁড়িয়েছে আমলাতন্ত্র, কংগ্রেসী অপশাসন, শোষণ, জোতদারী তর্জন এবং জমিদারের লেঠেলদের বিরুদ্ধে। নতুন বামফ্রণ্ট সরকার তাদের পক্ষে। সংগ্রামী ঐতিহ্যাশ্রয়ী এমনি ধরণের তিনটি গান তোলা যাক। যাতে দেখা যায় পঞ্চায়েত রাজের সদর্থক পদক্ষেপের প্রতিও চাষীদের অটুট বিশ্বাস ও আস্থা দানা বেঁধেছে।

১, টুসু ইবার জ্যাগছে চাষী
কাস্তেতে ত্যাখ দিচ্ছে সান—
রক্তে রুয়া ফসল তুলে
খামারে আজ গাইছে গান।
কে আছে বল্‌ বাপের বেটা
সোনার ফসল ক্যাড়বে তার ?
মহাজনের মুখ শুকালো
গা ঢাকা দেয় জমিদার।

নির্গুণবাবু কৃষক নেতা
চাষীর ল্যাগে ঢ্যালছে প্রাণ—
টুসু ইবার জ্যাগছে চাষী
রক্তে রুয়া তুলেছে ধান।

কিংবা রূপাই মাঝির বীরত্ব ঃ

২. অদালীতে রূপাই মাঝি বাড়ুজ্যাদের বর্গাদার
বক্তে রুয়া ধান তুলেছে—ভ্যবে গেছে তার থামার।
গুণ্ডা দিয়ে মালিক তাকে ম্যারতে য্যায়ে হটেছে।
মুখ শুকায়ে আমাসি ইখন—যে ঘটনা ঘটেছে।

১নং গানটিতে চাষীর সংগ্রামী ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। ২নং গানেও চাষী সমাজের বীর্যবত্তা। ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু গানটি কাহিনীভিত্তিক বলে খুবই আকর্ষণীয়! এখানে পুরুলিয়ার আদিবাসী সাঁওতাল অধ্যুষিত অদালী গ্রামের রূপাই মাঝি নামক জনৈক চাষীর বীরত্বগাথা নির্মিত হয়েছে।

৩. খাজনা মকুব—এবার টুসু চ্যষছে চাষী লিজের ক্ষেত
বীজ ধান সার দিচ্ছে ইখন চ্যাঁড্‌রা পিটে পঞ্চায়েত।
সেচের কথা ভাবছে সরকার লেভি আদায় নাইগো আর
সোনার ধানে ভরবেক টুসু ইবার চাষীর ক্ষেত থামার।[৯]

৯. টুসু গান ও সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন : মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়; 'পশ্চিমবঙ্গ'

টুসু গানে সমাজ-মনস্কতা

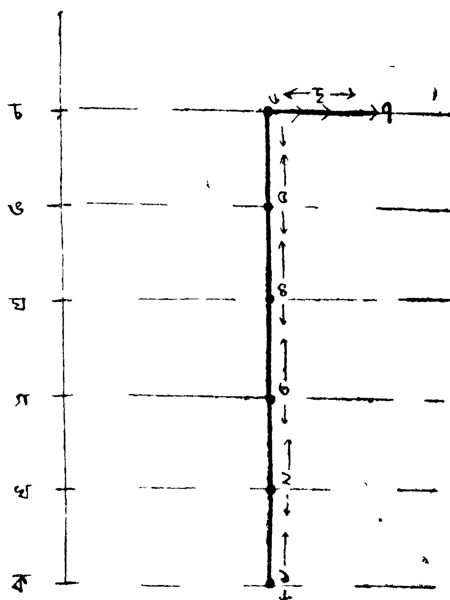
সনৎকুমার মিত্র

টুসু সঙ্গীত-প্রধান উৎসব। সঙ্গীত বাদ দিলে টুসুরও কোনো অস্তিত্ব নেই।[১] এই সঙ্গীত যিনি রচনা করেন, যিনি গান করেন এবং যাঁরা শোনেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ জড় বা ভাব জীবন ও জগতের সামাজিক ও সাংসারিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা, অভাব-অভিযোগের বিচিত্র বর্ণ-সুষমা ভাষায় ও অভিনব সুরে আত্মপ্রকাশ করেছে 'টুসু' নামক গেয় কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতি যেমন বিচিত্র বর্ণে প্রজাপতির পাখাকে রঞ্জিত করেন, তেমনি এই টুসু গানের রচয়িতা তাঁর হৃদয়ের সব রঙকে উজাড় করে এই গানগুলিকে রচনা করে থাকেন। সেই গান কখনও আনন্দে উজ্জ্বল, কখনও বা দুঃখের যন্ত্রণায় নীল অথবা দারিদ্র্য ও বঞ্চনার দীনতায় কালো। এক কথায় টুসুর এই বাণীরূপের অন্তস্থল থেকে সমস্ত সমাজ কথা বলে উঠেছে, সর্বস্তরের জীবন ভাষা পেতে চেয়েছে। এখানে আমরা সেই ভাষার স্বরূপ কি, কোথায় তার মূল গিয়ে প্রবেশ করেছে—তারই অনুসন্ধান করবো। তার আগে 'টুসু' উৎসবের পটভূমিটি রচনা করে নেবো এবং পরে সেই চালচিত্রের সামনে সুবৃহৎ সাংস্কৃতিক বাঙলার আন্তর-প্রতিমা জীবন-দেবতা, সংগ্রামী ঐতিহ্য এবং মানস-মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।

'টুসু' অগ্রাণ সংক্রান্তি বা পয়লা পৌষ থেকে আরম্ভ হয়ে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত—এই এক মাস স্থায়ী উৎসব। এই সময় কৃষি-নির্ভর বাঙালীর সারা বছরের অন্ন-সংস্থানের, জীবন-রক্ষার মূল উপাদান ধান ঘরে আনবার, রক্ষণাবেক্ষণ বা সংগ্রহ করবার সময়। সেই জন্য এই টুসু উৎসবকে সকলেই : ক. শস্যোৎসব বলতে চেয়েছেন। ['টুসু তেমনি ফসল ঘরে আনার উৎসব'।] আবার কেউ কেউ টুসুর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন : খ. উর্বরতা-বৃদ্ধির ব্যগ্রতা বা কামনা অথবা Fertility Cult-এর অবশেষ অথবা অনুকৃত ইন্দ্রজাল [Imitative Magic]। বর্তমান প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে এই বিষয়গুলির বিশদ পর্যালোচনা অবান্তর ঠেকবে, তবুও টুসু গানের সমাজ-মনস্কতা বিচার করতে গেলে উক্ত দুই-মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

কারণ, যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও তৎজাত মনস্তাত্ত্বিক সামিয়ানার নীচে টুসু উৎসবের আসর জমে তার পরিচয় না জানলে টুসু গানের সমাজ-মনস্কতাকে বোঝা বা না বুঝে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

প্রথমত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সময়ের ও কালের [season] ঋতুগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে বলা অনেকটা সঠিক হবে: 'অনুভবের সব সীমানা ছুঁয়ে এই গানে ঝাড়খণ্ডের মানুষের প্রাণ আপনাকে খুলে দেয় ভাঁজে ভাঁজে। নোতুন ফসলের সম্পন্ন সত্তার খুশির সোনা ছড়ায়। টুসু গানে তারই আভা। দুঃসহ দুঃখের ভারি দিনগুলোকে ঠেলে মন এবার তৃপ্তির স্বস্তিতে ভরা'।[২] অর্থাৎ টুসু উৎসব ও সেই উৎসবকে অবলম্বন করে গান রচনার একটা প্রেক্ষাপট-রেখার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তা বলে কি টুসু 'শস্য-উৎসব' [Harvest Festival]। 'শস্য-উৎসব' বলতে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা কোথাও নেই। তবে অভিধানকে অনুসরণ করলে বলতে হয় যে টুসু 'ফসল কাটার ও গোলাজাত করার সময়'কার উৎসব,—এবং তাই একে ফসল কাটা ও তা গোলাজাত করা সংক্রান্ত উৎসব বলতে পারি না বলেই, বলেছি: 'যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাঘে ধান্য পাকিয়া উঠে ও প্রতিগৃহে নূতন শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখনই এই উৎসব আরম্ভ হয়'।[৩] এবং এ-কারণেই এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'ধন্যবাদ-প্রদান'কারী উৎসব ['harvest festival = thanks-giving service for harvest': Oxford Dictionary of Current English : 1957 ed. p. 365]। এখন প্রশ্ন হতে পারে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণ কি? কারণ, ১. এই টুসু যদি শস্য-[ফসল কাটা ও তা গোলা-জাত করা]-সংক্রান্ত উৎসবই হবে, তবে যে টুসু গান টুসু উৎসবের অবয়ব ও আত্মা, দেহ ও অস্তিত্ব তার প্রতিবছরেই রচিত হাজার হাজার গানের কোথাও শস্যের কথা নেই কেন? এতে টুসু অঞ্চলের মানুষ-জনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা, সমসাময়িক ঘটনা-জীবন-জগৎ সব কিছুরই কথা আছে, নেই কেবল শস্যের ভালো মন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ। ২. যে কোন মানব-কর্মের একটি কায়িক, ব্যাবহারিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে। প্রথম দুটি বাহ্যিক, তৃতীয়টি অন্তরশায়ী। এবং একথা বলাই বাহুল্য যে এই আন্তরক্রিয়ারও বাহ্যিক অভিক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রত্যক্ষ থাকে না। ফলে, সমগ্র আন্তরক্রিয়া এবং তার প্রকাশের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক ভাবারোহনীয়তা [climax] আছে তাকে একটি চিত্রলেখার-[graph] সাহায্যে উপস্থিত করলে দাঁড়ায়:



বিশ্লেষণ : ক.=মাঘ শেষ ও ফাল্গুন। খ.=চৈত্র। গ.=ভাদ্র। ঘ.=আশ্বিন। ঙ.=কার্তিক চ.=অঘ্রাণ+পৌষ। ছ.=পৌষ।

১.—উর্বরতার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। ২.—ফসলের আকাঙ্ক্ষা ও ভালো বীজ। ৩.—অঙ্কুরোদ্গম। ৪.—ফলের আগমন। ৫.—ফল রক্ষা। ৬.—পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি। ৭.—ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা।

ওপরের ঐ চিত্রলেখা এবং তার বিভিন্ন বিন্দুগুলি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি যে প্রায় সারা বছর ধরে সূর্যের বার্ষিক গতি অনুসরণ করে যে মাসগুলি ক্রমান্বিত হচ্ছে তাতে ফসল এবং তার উৎপাদনকারীর মেহনত ও উৎপাদনকে অবলম্বন করে মানসিক বেগমাত্রা ঊর্ধ্ববিন্দুতে পৌঁছাতে চায়। কিন্তু ফসল ফলানোর সমস্ত প্রক্রিয়া ক্রান্তিবিন্দুতে পৌঁছে আর ঊর্ধ্বমুখী থাকে না। একটি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিজনিত কৃতজ্ঞতায় অবসিত হয়ে সমান্তরাল রেখায় রূপান্তরিত হয়। এই সমান্তরাল অবস্থাই harvest festival thanks-giving service হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

মানসিক বেগমাত্রার এই ক্রান্তিবিন্দুতে উপস্থিত ও তারপর স্থিতিস্থাপক [elastic] অবস্থায় পৌঁছানোর বিষয়টিকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর[৬] বাংলার ব্রত' [১৩৬৭] গ্রন্থে কিছু

পৃথক ভাষায় ও উদাহরণে উপস্থিত করলেও আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে তার অনেকখানি সঙ্গতি আছে। যেমন: 'আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন। প্রথম ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্বে। চাষীরাই বেশি এ ব্রত করে—রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে। একে বলা যেতে পারে হরিতা দেবী—সবুজবর্ণ। এই পূজা ক'রে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর পূর্ণিমায় যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অঘ্রাণ, যখন পাকা ধান ঘরে এসেছে—ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরো কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করেন, যেমন ভাদ্রে, কার্ত্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি তিন লক্ষ্মীব্রতেরই ছাঁচে ঢাল।' [পৃ. ২৭]।

অতএব সমগ্র শস্য-ব্যবস্থার অন্তর্গত মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশকে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে আমরা টুসুকে যথার্থ আভিধানিক অর্থে 'হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল' হিসাবে গ্রহণ করবো। এবং টুসু সঙ্গীতের উৎস ক্ষেত্রের এই পটভূমিকাকে মনে রেখেই তার বাণী দেহের সমাজ-গোত্র নির্ণয় ও বিচার করবো।

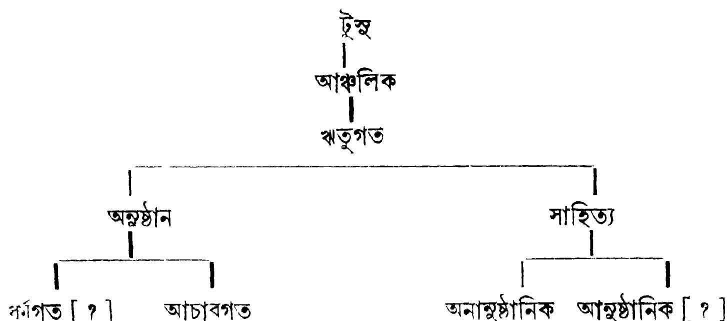
দ্বিতীয়ত, টুসু উৎসবের মধ্যে কি উর্বরতা [fertility] বৃদ্ধির ব্যবস্থা বা কোন ইন্দ্রজাল [Magic] আছে? ১. আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে টুসু উৎসব যে সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন,—ঠিক সেই সময়েই, আর ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন থাকে না [সব কাজেরই একটি নির্দিষ্ট রীতি বা স্তর আছে; বেশী দূর যেতে হবে না, মনুষ্য-সমাজের স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে প্রজনন ক্ষমতার সূচনা থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রিয়া-আচার অনুষ্ঠান ও তার মানসিকতার ব্যাখ্যা করলে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হবে]। আবার মাঘের শেষ ['যদি বর্ষে মাঘের শেষ / ধন্য রাজার পুণ্য দেশ'] বা ফাল্গুন থেকেই সেই মানসিকতা বা তজ্জাত কাজ আরম্ভ হবে। তাই টুসুকে উর্বরতা বৃদ্ধির উৎসবানুষ্ঠান বলি কি করে।

২. টুসু উৎসব আলোচনায় ইন্দ্রজাল [Magic], মৃত ধানের প্রতীক, শস্যের পুনর্জীবন লাভের কামনা ইত্যাদির বিষয় যে বলা হয়ে থাকে, তার পেছনেও সত্য-তার জোর খুবই কম। কারণ, ক. 'টুসু' নাম দিয়ে যে খল বা খলা গুলি [মাটির খুরির মতো দেখতে, কানায় জোড বা বিজোড সংখ্যার প্রদীপের আকৃতি দোনা করা থাকে][4] কুলুঙ্গিতে রেখে ফুল ইত্যাদি দিয়ে গান করা হয় প্রতি সন্ধ্যায় এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন স্থানীয় নদী বা পুষ্করণীতে বিসর্জন দেওয়া হয়, তার মধ্যে

ব্রতাচার বা দেবপূজার মতো কোন শুদ্ধানুষ্ঠান নেই। ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানের ফলে সুনির্দিষ্ট যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এই রকম : ১. সর্বত্র 'সরার গর্ভ' [?] বা খল আবশ্যিক নয়। বহু বহু জায়গায় কুলুঙ্গিতে কেবল দু-চারটি গাঁদা বা অন্য ফুল, দু-চারখানা বাতাসা রেখে, কুলুঙ্গির চারপাশে আলপনা দিয়ে বা না দিয়ে গানের নৈবেদ্যে টুসুকে নিবেদন করা হয়। ২. বহু বহু জায়গায় গোবরের নাড়ু, তুঁষ বা হলদে কাপড়ের কোন ব্যবহার দেখা যায় না। ৩. সারা পৌষ মাঘ বা মাঘ শেষের তিন বা সাত দিনের মধ্যে যথাক্রমে দুই বা ছ-দিন সন্ধ্যা [শীতের কাল] থেকে দু-তিন ঘণ্টা তক্ গানের নৈবেদ্য-গানের মন্ত্রগানের উপচার নিবেদন করা হয়; আর পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতটাই ভারি জাঁকের। সারা রাত বা গভীরতর রাত পর্যন্ত চলে গানের আসর। ৪. 'ব্রত উদ্‌যাপিত হয় শুদ্ধাচারে স্নান করে। টুসু হয় রাত্রে, স্নান করার প্রয়োজন হয় না।'[৫] ৫. নিকটস্থ নদীতে বা পুষ্করিণীতে মকর সংক্রান্তির স্নানের পর নতুন কাপড় পরা এবং দোকান থেকে কিনে বা বাড়ী থেকে বয়ে-নিয়ে-আসা খাবার গ্রহণ প্রায় আবশ্যিকভাবেই করে থাকে। ৬. এ রকম বহু চৌদোল দেখা গেছে যার সঙ্গে টুসু খল বা মূর্তি বাহিত হয়ে আসছে না। ৭. টুসু কেবল কুমারী মেয়েদের অনুষ্ঠান নয় সব বয়সের, সব অবস্থার নারী মাত্রেরই অনুষ্ঠান হিসাবে অবশ্যই গণনীয়। ৮. সামান্য একটু সাধারণ বিবেচনা প্রয়োগ করলেই বোঝা যাবে যে, ভাদুর প্রভাব নয়, মানস-বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 'টুসু ধারণায়' নরত্বারোপপূর্বক মূর্তিরূপ সৃষ্টি হয়েছে। ৯. তুঁষ ও গোবর ব্যবহার যে কোথাও কোথাও হয় টুসু উৎসব অনুষঙ্গে, তাই দেখেই যদি উর্বরতার গবেষণায় পৌঁছাতে হয় তা-হলে, মাটির বাড়ীর দেওয়াল গাঁথবার সময় দেওয়ালকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্যে বা এই পৌষ মাসেই ধান রাখবার গোলা বা চেঁচারির তৈরী পাত্রকে ['পালই'] গোবর তুঁষ ও মাটি মিলিয়ে যে প্রলেপ [plaster] দেওয়া হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সময় ঐ গোলা বা 'পালই'কে সিঁদুর চন্দনের ফোটা দেওয়া হয় তাও কি উর্বরতার প্রতীক? ১০. তাই টুসু ফসল আনার সময়কার উৎসব; যে শ্রম, মেহনত, বিশ্বাস, আচার, প্রকৃতি-অনুকম্পা প্রভৃতির সাহায্যে ফসল ঘরে এলো তাদের সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করার উৎসব, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার উৎসব; 'সমানুভব বিশিষ্ট দলবদ্ধ[৬] মেহনতী মানুষের লোকায়ত ভাব ভাবনা ও জীবনবৃত্ত'কে[৭] সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করার উৎসব। যেমন, 'কামনাকে সফল করার তাগিদেই তৎকালের যাবতীয় সঙ্গীত প্রয়াস,'[৮] তেমনি কামনা সফল হয়েছে অতএব আমাদের সঙ্গীত প্রয়াস

অব্যাহত থাক। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ক্ষুধার্ত, অন্ন আবশ্যক, অতএব গান' গাও—এর প্রতিরূপে আমরা টুসু উৎসবে এটাই বলেছি বা বলে থাকি 'ক্ষুধা মিটেছে, অন্ন পেয়েছি অতএব গান গাও'।[৯]

।। ২ ।। ওপরে রেখে-আসা মানসিকতা টুসু গানের উদ্ভব-ঠিকানাও প্রচারের ভিত্তি। এই গানের বিষয়বস্তুও উক্ত মানসিকতার সন্তান। এখন আমাদের এই সন্তানের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার করে একটি প্রত্যয়ে পৌঁছাতে হবে। তার আগে একটি ছকের সাহায্যে টুসুর অনুষ্ঠান ও সাহিত্য বিভাগদ্বয়কে স্পষ্টরূপে, উপরিভাগ-সহ আমাদের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরার প্রয়োজন। যেমন :



এই ছকের অন্তর্গত ১নং উপবিভাগটির আমরা আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে যথাসম্ভব সেরে এসেছি। দ্বিতীয় উপরিভাগের আলোচনা বর্তমানে প্রয়োজন।

আমরা আগেই বলে এসেছি যে টুসু একটি বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষ ঋতুতে অনুষ্ঠিত উৎসব। এবং এই উৎসবে গানই সব,—প্রাণ চলে গেলে যেমন দেহ অর্থহীন পচনশীল বস্তুতে পরিণত হয় তেমনি টুসু সঙ্গীত বাদ দিলে টুসু অনুষ্ঠানের কোন মূল্য থাকে না। এমন দিক নেই, বোধ হয় জগতের এমন বিষয় নেই যাকে এই টুসু গান স্পর্শ করে না। এবং টুসু গানের দুটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে : ক. টুসু উৎসবের সময় ছাড়া টুসু অঞ্চলের মানুষ এই গান গাইতে, রচনা করতে খুব কঠিন বা কষ্টসাধ্য বলে মনে করে, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য, সারল্য ফুটিয়ে তুলতে পারে না—ধারা জলে যেমন চাতকের তৃষ্ণা মেটে, নতুন বর্ষায় যেমন ব্যাঙেরা আপনিই গান ধরে, কদম্ব-কামিনী যেমন স্বতঃই সৌগন্ধ বিতরণ করে, বাসন্তিক পূর্ণচন্দ্রের মায়ায় যেমন কথা আপনিই গান হয়ে যায় ঠিক তেমনি টুসু ঋতুতে হাজার হাজার রকমারি গানের ফুল ফুটে রাঢ় বাঙলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলকে পরিপ্লাবিত করে ফেলে।

খ. 'একদিনের পূজার ফুল যেমন পরের দিন বাসি হইয়া যায়, তেমনই এক বৎসরের টুসু গান পরের বৎসরেই অপ্রচলিত হইয়া যায়; নূতন নূতন গান রচনা করিয়া নূতন বৎসরে টুসুর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়।'[১০]

॥ ৩ ॥ 'লেনিনের মতে আর সব কিছু বাদ দিলেও শিল্পকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং এই সত্য জীবনের উন্নতির রীতিনীতি ও তার যথার্থ প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচিত। লেনিনের মতে, শিল্পের শক্তির এবং তার বিশ্বাসের জোরের প্রধান উৎস যে জীবন, সাহিত্যিকদের সেই জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।' [১১]

এই সত্যনিষ্ঠা এবং সম্যক জ্ঞান আমাদের খুব ভালোভাবেই চিনিয়ে দেয় যে টুসু গানগুলি টুসু অঞ্চলের একেবারে নিচের তলার মানুষদের হৃদয় উৎপাটিত-করা ধন, যা তারা সমাজকে অঞ্জলি দিয়ে থাকেন। টুসু প্রধানত যে অঞ্চলের উৎসব, যেখানকার সমাজ-বাগিচায় এই গানের ফুল ফোটে, যেখানকার মানুষের হৃদয়-মন জীবন এই গানের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করে,—যেখানকার একদিকে কাঁকুরে পথ আর সবুজ সরল শালবন, দিগন্ত-বিস্তৃত ঊষর লাল মাটি, মাঝে মাঝে অনুচ্চ পাহাড়ের আঁখি পল্লবের কোলে নীল আকাশের গভীর অথচ ক্লান্ত দৃষ্টি; অন্যদিকে বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রের কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির 'পর ধীর পদক্ষেপে মায়াবী অন্ধকারের মন্থর আবির্ভাব মূর্ছাহত ধরণীকে উদাস করে তুললেও এর অধিকাংশ কালো মা মুষগুলোর অন্তরের আবেগ-রঙ ও শ্যামলিমা হারায় না—গোপনও থাকে না। পান্থপাদপে আঘাত করলেই যেমন প্রচুর নির্মল জল নির্গত হয়—ঠিক তেমনি নতুন ফসল ঘরে ওঠার [এই রূঢ় রুক্ষ ভূমির কৃপণ প্রকৃতি যতটুকুই বা ফসল দেন] সামান্য সুখাভিঘাতে, প্রচণ্ডতম মেহনতের সামান্যতম সার্থকতায় প্রচুর পরিমাণে কাব্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। জীবনের রঙে রঙিন, অভিজ্ঞতার তাপে নমনীয় ও আবেগের চাপে সরস এই সুপ্রচুর টুসু গানের ভাণ্ডারে এমন অনেক কোহিনূরের সন্ধান মেলে যা স্বচ্ছন্দে বঙ্গভারতীর কণ্ঠে লগ্ন শ্রেষ্ঠ রত্ন-হার হিসাবে মর্যাদা লাভের অধিকারী। যেমন ঃ

'এত বড পোষ পরবে রাখলি, মা পরের ঘরে,
ওমা পরের মা কি বেদন বোঝে
অন্তরে পুড়ায়ে মারে।
আমার মন কেমন করে, [মাগো] আমার মন কেমন করে,
যেমন তাতা কড়ায় খই ফোটে ॥

এই গানটির মধ্যে দিয়ে সমস্ত বাঙালী সমাজ যেন কথা কয়ে উঠেছে—এত বড়

পর্বের দিনে, সারা দেশ যখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তখন পরের ঘরে [১২] এইভাবে আটকে থাকার মতো দুঃখ কন্যাজীবনে-বধূজীবনে আর কি আছে? মেয়ের দুর্জয় অভিমান কি অসাধারণ দুটি উৎপ্রেক্ষার মধ্যে দিয়ে বাঙালী বাপ-মায়ের বুকে শেল হয়ে বিঁধেছে। "লেনিন বলেছিলেন: 'বুর্জোয়া শিল্পের দোষটাই এইখানে—সব সময়েই এটি সুন্দর করে দেখায়।"[১৩] কিন্তু এখানে—এই লোকসঙ্গীতে কোন কষ্টকল্পিত চেষ্টাকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস নেই, অন্তরের প্রবলতম দুঃখ সুন্দরতর সঙ্গীতরূপে প্রত্যক্ষ ভাষা বাহন নিয়ে সহজেই বেরিয়ে এসেছে।

১. 'ত্রিশ দিন র‍্যাখলাম টুসুয় তেল-সলিতা দিয়ে গ,
আর রাখতে লারলাম টুসু মকর আইছে লিতে গ।
ছাচি খাও মা, ছেনা খাও মা, ওদর ভরে গ,
কাল সকালে চলে যাবে, একবার ফিরে চাও গ'॥

২. 'রাত ফুরাল, মকর গেল,
বাঁধ গ মাথা জননী।
আর তো টুসু কাঁদিস না গ
বিদায় দুব না আমি'॥

এই গানগুলিকে কি আমরা বাঙালীর আগমনী-বিজয়া গানের আদি লৌকিক রূপ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না?

বালিকা কন্যা বাপ-মাকে বড় পরবের দিনেও ছেড়ে থাকার এই দুঃখকে ভুলতে রাজি ছিলেন, কিন্তু যেখানে থাকার একমাত্র যে আকর্ষণ দুঃখ-সুখ-মিশ্রিত প্রধানতম যে অবলম্বন তাতেও তো কাঁটা পড়ে আছে। স্বামী সম্পদে ভাগ বসিয়েছে সতীন এসে। অতএব এমন অবস্থায় বাঙালী বধূর যে মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই ফুটে ওঠে তা এই রকম:

'একই গাডী কাঠ দু-গাডী কাঠ,
কাঠে আগুন লাগাবো,
আগুন যখন হুদহুদাবে
সতীনকে ঠেনে দিব।
সতীন আমার জনমের বাদী ।।'

সতীন যে সমস্ত বিবাহিত জীবনে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদী তাতে আর সন্দেহ কি? অতএব সংসার যাপনের সহনীয় নানা অভাব অনটনের মধ্যেও যে চরমতম দুঃখ সৃষ্টির কারণ তাকে কেবল আগুনে ঠেলে ফেলে দিয়েই তৃপ্তি নেই:

'আয় রে সতীন মারবি ন কি
তবে কি আমি মার খাব,
কালীক থানে খুঁটা গাড়্যে
তবে পাঁঠা বলি দিব ॥'

এইভাবে সতীন সম্পর্কে অনেক জ্বলন্ত, ভীষণ, কঠোর, হৃদয়হীন এবং অসামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা টুসু গানে শোনা যায়। অনেকে বাইরে থেকে ভাবতে পারেন এ-কেমন অসামাজিকতা। 'কিন্তু সতীনের পক্ষে তো কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ, এ-দেশে একদিন মেয়েরা কুমারী জীবনেই ভবিষ্যৎ সতীনের কণ্টক দূর করবার জন্যে 'সতীন কেটে আলতা' পরবার ব্রত করত। সেই কথাই এখানে টুসু উৎসব উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। কুমারী হৃদয়ের মধ্যেও যে কি ভয়ঙ্কর জিঘাংসা শৈশব থেকেই লালিত হয়ে থাকত এই ছড়াগুলো তার প্রমাণ। এগুলো কেবলমাত্র একটা বিশেষ যুগের বিশেষ একটা সামাজিক অবস্থাই নির্দেশ করে না। বরং চিরন্তন নারী মনের এক গোপন মনস্তত্ত্বের দ্বার খুলে দেয়। সেই জন্যই গানগুলোর 'সামাজিক এবং সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীতও চিরন্তন এক বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে'।[১৩] এই বিচার-মাধ্যমের অপর এক কোন থেকে পর্যালোচনার জন্য এখানে আমরা টুসুর বকলমে সতীন সম্পর্কে আরও একটি গানের উদাহরণ দেবো :

'ও পাড়া যেও না তুষু, ওপাড়াতে সতীন আছে,
জল দিলে জল খেও না,
পান দিলে পান খেও না,
পানের ভিতর ওষুধ দিবে
মা বলিতে পাবে না।'

এ-ছাড়াও সংসারের অপরাপর সম্পর্ক, যেমন বাবা-মা-বোন-শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-ভাসুর-দেবর প্রমুখদের নিয়েও অসংখ্য টুসু গান প্রচলিত আছে, এখনও রচিত হয়ে থাকে। এইসব গানের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র মানসিকতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে বাঙালী সমাজের দ্বন্দ্ব-জটিল অবস্থাটিকে নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

১. 'বাপের ঘরে কাপড় দিল
ধারে ধারে ধাদ্‌কি ফুল,
'শ্বশুর ঘরের লোকে বলে
গেল লো তোর জাতি কুল।

ছোটাই বিয়া দিলি মা কেনে
আমি ঝাঁপ দিব দইরার মাঝে ॥'

এই রকম আরো আছে :

২. 'এই বছরের পোষ পরবে
সবাই পরবে লাল শাড়ী,
আমার শাউড়ী ছাঁচড়া মাগী
মোক্ দিল গ নীল শাড়ী'।

শাশুড়ীর এই অত্যাচার সয়েও কোনরকমে থাকা গিয়েছিলো, কিন্তু যখন :

৩. 'মাছ কাইটলাম চাকা চাকা
মাছের কাটা সিজে না,
ভাশুর হয়ে জিগির করে
ই জীবন আর রাইখবো না'।

তখন আর তো শ্বশুর ঘরে থাকা যায় না। ভাশুরের কুৎসিত ইঙ্গিত ও আচরণ যে সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে বসে। তখনই বধূ শ্বশুর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী পাড়ি দেয়, কারণ এ লজ্জা তো কাউকে প্রকাশ করার নয়। কিন্তু মা কন্যাকে শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেখে পরম সোহাগে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করেন।

আমরা আগেই বলেছি যে প্রতি বছরেই হাজার হাজার নতুন নতুন টুসু গান রচিত হয়। এবং মাত্র একবছরে যত টুসু গান রচিত হয়ে থাকে, তাকেই যদি সংগ্রহ করা যায় তবে তা-দিয়েই কয়েক খণ্ড মহাভারত রচনা করা যেতে পারে। এবং যদি ঐ সমস্ত গান সব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বিষয়, মনোভাব ও বক্তব্য-অনুযায়ী বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা যায় তবে এই অঞ্চলের দরিদ্র-শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, তার মনস্বিতা, তার সমাজ ও পরিবার-বিন্যাসেরর একটি পরিপূর্ণ চিত্রকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কে করে সেই কাজ—কারণ সমাজমনস্বতা-বিজ্ঞান বুদ্ধি-যৌথ কর্মৈষণা-অর্থবল ও অকুণ্ঠ পরিশ্রমেচ্ছা ছাড়া এমন কাজ হবার নয়। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং জ্ঞাতিবিদ্যাগত শৃঙ্খলা ব্যতিরিক্ত-ভাবে অনেক টুসু গানই সংগৃহীত হয়েছে।

॥ ৪ ॥ আমরা আগের একটি অনুচ্ছেদে টুসু গানের যে একটি সারণি তৈরী করেছি সেখানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে অনানুষ্ঠানিক নামে টুসু গানের একটি উপরি-ভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন কোন লোকসাহিত্য গবেষক অনুষ্ঠান ছাড়াই [পৌষ বা মকর পরব-এর সময়ের বাইরে] যে সব টুসু গান হয় তাদের অনানুষ্ঠানিক টুসু গান বলতে চেয়েছেন। এ কথা ঠিক যে বিগত ভাষাভিত্তিক

প্রদেশ গঠনের পূর্বে [১৯৫৬ খ্রীঃ], অথবা বঙ্গবিহার সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, এখনও ভোটের সময়, অথবা কোন মেলা-পার্বণে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকেরা নিজেদের উদ্দেশ্যানুযায়ী ও প্রচার-সপক্ষে কবিতা রচনা করে টুসু সুরে গান করে থাকেন। মনে হয় এই সমস্ত টুসু গানকে অনেকে অনানুষ্ঠানিক বলতে চেয়েছেন। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

'শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাংদেখাই ॥ধ্রু॥
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাঙলা ভাষায় দিলি ছাই।

আমরা সকলেই জানি যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ সহ অপরাপর দেশপ্রেমিক কবি বাউল-সারি-রামপ্রসাদী ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের সুরে অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু, সেদিনও যেমন, আজও তেমনি ঐ সব গানকে কেউ-ই বাউল বা শাক্ত সাধনার অঙ্গ হিসেবে বাউল বা রামপ্রসাদী বা সারিগান হিসেবে চিহ্নিত করেন না। ঠিক এই কারণেই বাস্তব অভিজ্ঞতার শরিক শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় যথার্থভাবেই বলেছেন : 'টুসু গানের রচয়িত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মহিলারা। এ গানের সুরও আরোপ করেন তারাই। সংগীত পরিবেশিত হয় সমবেত কণ্ঠে। একক শিল্পীর কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। সংগীতকালীন কোনো যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার রীতি নেই। তবে বর্তমানে পুরুলিয়া অঞ্চলে পুরুষরা নানা যন্ত্র সহযোগে টুসু গান পরিবেশন করেন। এ সব গানের অধিকাংশই রাজনৈতিক বিষয়ের উপর শিক্ষিত মানুষের রচনা···টুসুর সঙ্গে মনের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে পৌষের ফসল। একটা বিশেষ মাসে বিশেষ কারণে টুসুর জন্ম। সেই মাসে বিশেষকরে—কারণটিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র টুসুর সুর সহযোগে গান গাইলেই কি টুসু গান হবে? যদি তা হয়, তবে পুরুলিয়ায় সাম্প্রতিক-কালের রাজনৈতিক বিষয়বস্তু-বিধৃত গানগুলিও টুসুগান। তবে এই সব গানগুলিকে যদি টুসু সংগীত না বলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ধারা-অনুসারী গণসংগীত নামকরণ করা হয়—তা হলে তার একটা যথার্থ ব্যাখ্যা থাকে। ···আমি পূর্বেই বলেছি টুসু বিশেষ মাসের বিশেষ কার্যকারণের উৎসব, কাজেই আমার বিবেচনায় এই গানগুলিকে টুসু সংগীত না বলে রাজনৈতিক লোকসংগীত, এঙ্গেলস যাকে বলেছেন political folksong—তাই বলা বিধেয়'।[১৪]

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে অনানুষ্ঠানিক কোন টুসু গান হয় না—ভাদুও

না। পৌষ পরবের টানেই ঐ সময়ে যে গানগুলি স্বতঃই জন্মলাভ করে, ঐ সময়েই মাত্র গীত হয় তাকেই কেবল টুসু গান বলে গ্রহণ করতে পারি। কারণ টুসু অনুষ্ঠানের প্রাণ তার গান—আর ঐ অনুষ্ঠানই এই গান সৃষ্টির অবলম্বন; দেহ ও প্রাণের মতো, এককে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। এই কারণেই আমরা বলেছি যে: 'টুসু উৎসবের প্রধান অঙ্গ তার পূজো নয়, তার সম্পর্কে কোনো ব্রত নয়, বরং তার সঙ্গীত। লোক-সঙ্গীত যে নিরক্ষরগোষ্ঠীর সমাজে কত শক্তিশালী তার প্রমাণ টুসু সঙ্গীত বা টুসুর গান। ...সেই গান কোনো পূজার গান নয়, ব্রতের গান নয়, আচারমূলক গান নয়, সে গান জীবনের গান। এইখানেই টুসু উৎসবের বিশেষত্ব। টুসু উপলক্ষ মাত্র, জীবনই তার লক্ষ্য'। [১৫]

এই 'জীবন' সামাজিকের জীবন, প্রাণাবেগে উত্তপ্ত জীবন। টুসুগান এই জীবনের ইতিহাস, এই জীবনের অন্তর্গত সমাজেব ইতিহাস, বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কের, তাদের সংগ্রাম ও সংঘাতের একান্ত বিশ্বাসী দলিল। এগুলি সংগৃহীত করে, তাদেব বিষয়-বিন্যাস করে, এক এক স্থান-কাল-পাত্রগত সমাজের মর্মকথাকে ব্যাখ্যায নিষ্কাশিত করে গণমানসের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পসৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এবং কেবল তার দ্বারাই টুসুগানের, শুধু গান বলি কেন, সমগ্র লোকসাহিত্যের যৌবনময়, সমাজ সচেতন, দ্বন্দ্বময় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ-গ্রাহ্য চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

টুসু উৎসব ও তার গান প্রসঙ্গে আমরা কি একথাও মনে করতে পারি : 'তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আনাগীরন্নু নোঽস্মিন্ন আভজস্বেতি··· [বৃহদারণ্যক, ১. ৩. ১৮.] অর্থঃ যেই দেবতারা বললেন, এতাবৎ যাবতীয় অন্ন গানের দ্বারাই নিজের জন্য লাভ করেছে। এখন আমাদের যে অন্নের অংশ ভাগ কর। টুসু কি এই অংশভাগের অনুষ্ঠান?

দ্রষ্টব্য ৩নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ১২০।

ভ্লাদিমির শেচরবিনা 'লেনিন এবং সাহিত্যের সমস্যা' বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২০।

স্বামী বাঙালী নারীজীবনের পরম সম্পদ, একান্ত নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হলেও বাঙালী নারী সারাজীবনে কিছুতেই যেন স্বামীর ঘরকে আপন করে নিতে পারেন না। নব্বুই বছরের বৃদ্ধাও রুষ্ট হয়ে আজও নাতি বা পুত্র বা পৌত্রকে বলে থাকেন: 'সংসারে পড়ে আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল!' প্রবীণতম বৃদ্ধা 'তোদের সংসার' কেন বলে থাকেন তার সমাজ মনস্তাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা-যোগ্য মনে করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ১০ নং পাদটীকা।

দ্রষ্টব্য ৪নং পাদটীকার গ্রন্থ।

দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ।

দ্রষ্টব্য ১নং পাদটীকার গ্রন্থ।

টুসু উৎসবের সার্বজনিকতার ধারা

ডঃ রেবতীমোহন সরকার

লোকউৎসব মানব-মনের দর্পণ বিশেষ। আনন্দ-মুখর উৎসবের আঙ্গিনায় জন-জীবন সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়—উৎসবের গতি-প্রকৃতি জীবনের অন্তর্নিহিত ধারাকে বেগময়ী করে তোলে। সেই উদ্দাম অথচ ছন্দোময় ধারা সমস্ত মলিনতা ও ক্ষুদ্রতাকে ধুয়ে মুছে জীবনকে করে তোলে সার্থক ও অর্থবহ। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক-ধারা আরও নিবিড় হয়, মানসিক সম্পর্ক-সূত্রের দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতের জনজীবনে লোকউৎসবের অভাব ত নেইই বরং সামগ্রিক জীবনচর্যাই লোকউৎসবের ভিত্তিমূলে রচিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। লোকউৎসবের নানা ধ্যান-ধারনা মানুষের সমাজকে করেছে প্রাণচঞ্চল, সমাজ ব্যবস্থাকে করেছে দৃঢ় সংবদ্ধ। কাজেই ভারতীয় মানবজীবন ধারার সম্যক উপলব্ধি করতে হলে লোকউৎসব-কেন্দ্রিক অনুসন্ধান বিশেষ কার্যকরী হিসেবে প্রতিভাত হয়। বহুযুগের ওপারে কোন এক স্মরণীয় মুহূর্তে এক একটি উৎসবের শুভসূচনা হয়েছিল এবং মহাযুগ ও মহাকালের সীমানা অতিক্রম করে এদের গতিশীলতা অম্লানভাবে রক্ষিত হয়েছে। তবে এই ব্যাপক ও বিস্তৃত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ মানসের নানা প্রতিফলন এদের সর্বময় সত্তাকে প্রভাবিত করেছে। আদিম সমাজের দেশীয় একান্ত আপন (Indigenous) চিন্তাধারা ও সামগ্রিক মানসিকতার পশ্চাৎপটে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান বিকাশলাভ করেছিল কালের প্রবাহে তাদের নানা আঙ্গিক পরিবর্তিত, পরিবর্জিত অথবা পরিবর্ধিত হয়েছে। সেই পরিবর্তন প্রবাহ অনেক সময় এত ব্যাপকতরভাবে ঘটেছে যে উৎসব আঙ্গিকের মূল রূপটি নানাভাবে আচ্ছাদিত হয়েছে। মহাকালের গতিপথে বিচরণশীল এই উৎসব-অনুষ্ঠান পারিপার্শ্বিক প্রধান ও বৃহৎ ঐতিহ্যের (Dominant and Great tradition) প্রত্যক্ষ প্রভাবে কখনও অবদমিত হয়েছে, আবার কখনও বা চিরতরে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে বিলীন হয়েছে। ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাসে এই ধরনের আদিম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা প্রসূত বহু আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী উন্নত

জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার ধারায় উদ্বেলিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহু সাংস্কৃতিক রূপরেণু (cultural traits) আদিম আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। কখনও তা ধীর গতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংঘটিত হয়েছে—আবার কখনও বা প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আদিম সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল মোটামুটি একরূপই হয়েছে ; অর্থাৎ মৌলিক বিষয়বস্তুটির সম্যক রূপান্তর ঘটেছে।

ভারতীয় উৎসবসমূহের সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে এই ধরনের রূপান্তর-করণের গতি-প্রকৃতির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস আদিম চিন্তাধারা ও তথাকথিত অগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানসিকতার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে প্রভাবিত। এইভাবেই যখন লৌকিক ধারনা-প্রসূত অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তখন সৃষ্টি হয়েছে দুটি ধারার সংঘাত ও সমন্বয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তির ফলে যখন আদিম মানসিকতায় তার বিস্তৃত ছায়া পড়ে তখনই তাকে বলা হয় সংস্কৃতকরণ (Sanskritization)। বহুযুগ ধরে কখনও ধীরে কখনও তীব্রগতিতে চলেছে এই সংস্কৃতকরণ। ফলে বহু আদিম আচার-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পোষাক পরে উন্নীত হয়েছে এবং সেগুলি অবলীলাক্রমে উচ্চবর্ণভুক্ত মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় আঙ্গিনায় প্রবেশলাভ করেছে। এমনিভাবেই সংস্কৃতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বহু আদিম চিন্তাধারা এবং আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবের অবস্থান্তর ঘটে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির কুক্ষিগত হয়েছে। ভারতীয় উৎসব, আচার অনুষ্ঠানের সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঐতিহ্যের (Little and Great Traditions) লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির (Folk and Brahmanic Culture) এবং আদিম ও আধুনিক ভাবধারার (Primitive and Modern thinking) এই পারস্পরিক যুগান্তব্যাপী সংঘাত-সমন্বয়, উপাদানের আদান-প্রদান প্রভৃতির সুচারু বিন্যাসধারার উদ্ঘাটন বিশেষ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে আমেরিকার নৃবিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ প্রয়াসের মাধ্যমে ভারতীয় লোকউৎসব ও গ্রামজীবনের এই বিশেষ দিকগুলির প্রতি প্রভূত আলোক সম্পাতের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। সার্বজনিকতাবাদ (Universalization) এমনই একটি মাধ্যম যার সাহায্যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাকিম ম্যারিয়ট (McKim Marriott) উত্তর প্রদেশের গ্রাম দেবতার সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিসরে বিকশিত গ্রাম দেবতা ও অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বগতি এবং ব্যাপকতা প্রাপ্তি

যখন ধীরে ধীরে সুবিস্তৃত অঞ্চল ও সামগ্রিক জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখনই তাকে সার্বজনিকতা বলে অভিহিত করা হয়।

পশ্চিমবাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কংসাবতী-সুবর্ণরেখা-দামোদর নদী-উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে এবং বিস্তৃত অরণ্যভূমিতে টুসু পরবের যে সমারোহ পরিলক্ষিত হয় তার সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এক বিশিষ্ট দিকের প্রতি আলোক সম্পাত করে। টুসু পরবের পশ্চাৎপট ও এর লক্ষণাবলী নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনুসন্ধানীরা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কারোর মতে টুসু আদিম চিন্তাধারার প্রকাশ, কেউ বলেন টুসু গ্রামীণ শস্যোৎসব ছাড়া কিছুই নয়। পৌষমাসে অনুষ্ঠিত টুসু পরবকে আবার অনেকে পৌষ-লক্ষ্মীর সমান্তররূপে কল্পনা করেছেন। টুসু কিন্তু আসলে একটি আদিম চিন্তাধারার প্রতিফলন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এটি খুব স্বল্প পরিসরে রূপলাভ করেছিল। বাংলা বিহার সীমান্ত প্রদেশের অরণ্যভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিম জনজাতি টুসু উৎসবের প্রবর্তক এবং কৃষিজীবী সমাজ ব্যবস্থায় টুসুকে শস্যের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে টুসু ছিল মানুষের সামগ্রিক চেতনার বিকাশ—বিশেষ একটি ধারনার পশ্চাৎপটে এর আরাধনা চলত। অপেক্ষাকৃত আদিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে মাটির সরার মধ্যে গোবরের নাড়ু রেখে তার উপর পিটুলি গোলা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অথবা মাটির উপর একটি ছোট গর্ত তৈরী করে তার মধ্যে গোবর দিয়ে ফুল ও মালার সাহায্যে সাজান হয়। এখানে গোবরের উর্বরতাশক্তির প্রতি একটি বিশিষ্ট ধারনার ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। কোথাও আবার সরার সাথে থাকে রঙ্গীন কাগজের তৈরী চৌদোল। তবে বিসর্জনের সময় এই চৌদোলগুলি ব্যবহারের রীতিই সর্বাধিক। টুসু উপাসনার প্রথম কথাই হল গান। গানের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-ভালবাসার কথাতেই কেন্দ্রীভূত। সাংসারিক জীবনের অভাব-অভিযোগ, দাম্পত্য কলহ এমনকি স্বামী পরিত্যক্তা কন্যার হৃদয়বেদনার কথাও অকপটে টুসুর উদ্দেশে নিবেদিত হয়। গানের ভাষা ও সুর একেবারেই গ্রামীণ চিন্তধারায় রূপায়িত—এর মধ্যে মাটির সোঁদা গন্ধ, বনভূমির মাতাল হাওয়া আর নদীর বুকে বর্ষার ঢল প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়। কাজেই টুসুকে আদিম জীবনের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত একটি একক হিসেবেই তুলনা করা যায়। এটি ছিল পাহাড়-অরণ্য-নদী অধ্যুষিত পারিপার্শ্বিকতার হৃদয়-নিঃসৃত প্রতীক যার গণ্ডী ছিল বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। টুসুর সামগ্রিক পশ্চাৎপট পর্যালোচনা করলে দেখা

যায় প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোন মূর্তি ছিল না। পরবর্তী কালে টুসুর নৃরূপতা (Anthropomorphism) ঘটেছে। সঙ্গীত কেন্দ্রিক এই বিমূর্ত (Abstract) উৎসবটি ধীরে ধীরে মূর্তিমান হল এবং এই প্রক্রিয়াটি পারিপার্শ্বিক উন্নত সমাজধারা হতে এত বেশী প্রভাবিত হয়েছে যে টুসুর মূর্তি সাধারণ খেলার পুতুলের রূপ থেকে শুরু করে লক্ষ্মীদেবীর আকৃতি ও প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে দেখা যায়, টুসুর উৎপত্তি ও বিকাশের পশ্চাৎপটে যে সব কিংবদন্তী ও আখ্যানগুলি রচিত হয়েছে তাদের মধ্যেও অগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে টুসুকে সোজাসুজিভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে—টুসুর আরাধনায় কোথাও বা সংস্কৃত মন্ত্রেরও প্রয়োগ দেখা গেছে। কৃষিকেন্দ্রিক আদিম গোষ্ঠী শস্যসংগ্রহের কর্মক্লান্তি অপনোদনে এবং তার সাথে অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে টুসুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিল। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিশেষ উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষ প্রক্ষেপে পৌষমাসের লক্ষ্মী-পূজোর সাথে একীভূত হয়ে পড়েছে। বাংলা বিহারের এই সীমান্ত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত টুসুর সামগ্রিক ধারা আনুপূর্বিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নানা উপাদানের প্রক্ষেপ অতি সহজেই চোখে পড়ে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃতকরণের ফলে সীমিত স্থানে বিকশিত একটি আদিম চিন্তাধারা প্রসূত সামাজিক অনুষ্ঠান ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সামাজিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সিংহদ্বার অতিক্রম করে ঐতিহ্যময়ী ধর্ম পরিমণ্ডলে (Traditional religious sphere) স্থান করে নিয়েছে। কালক্রমে একটি বিশেষ গণ্ডীভুক্ত ও সীমিত আদিম গোষ্ঠী প্রবর্তিত ও পরিচালিত অনুষ্ঠান সার্বজনিকতা (Universality) লাভ করে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে। আদিবাসী ও নিম্নবর্ণ ভুক্ত গোষ্ঠীদের পাশাপাশি উচ্চবর্ণের মানুষেরাও টুসুর আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। সার্বজনিকতাবাদের সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় টুসু উৎসবের মত এত প্রকট ও বাস্তব উদাহরণ বুঝি আর নেই! এই উৎসবের প্রতিটি স্তরের খুঁটি-নাটি ঘটনা, বিভিন্ন আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যবহারপ্রণালী এবং তার সাথে গ্রাম, অঞ্চল ও প্রাকৃতিক বিভাজন ভিত্তিক সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঐতিহ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার ব্যাপক রূপটি প্রতিভাত হবে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের পশ্চাৎপটে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানটির সার্বজনিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত করে তুলেছে।